দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৪১ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN: 1607-0380 (Print), DOI: https://doi.org/10.63809/DOP/V04112/AT24003

# বাংলাদেশের ম্রো নৃ-জনগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক ধর্ম পরিবর্তন: একটি পর্যালোচনা (Recent Religious Conversions of the Mro Ethnic Group in Bangladesh: A Review)

**মো. আবু তাহের***

**সারসংক্ষেপ**

বাংলাদেশে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উল্লেখযোগ্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ম্রো জনগোষ্ঠী অন্যতম। যাদের বর্তমান আবাস পার্বত্য বান্দরবান এলাকায়। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বা আদি ধর্ম থাকলেও কালের বিবর্তনে তাদের ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে। ঠিক তেমনি ম্রো জাতিগোষ্ঠীর আদি একটি ধর্মবিশ্বাস থাকলেও, সম্প্রতি তারা সেটি পরিবর্তন করে নতুন একটি ধর্ম প্রবর্তন করে। এই নতুন ধর্মটির নাম "ক্রামাধর্ম"। বিভিন্ন আদিবাসী বিষয়ক বই, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে এই নতুন ধর্মের ইতিহাস, বিশ্বাস, নৈতিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রবর্তক, এর প্রচার-প্রসারসহ নানা দিক জানা বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

**চাবিশব্দ:** ম্রো, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, পার্বত্য এলাকা, সর্বপ্রাণবাদ, ধর্মান্তর, ক্রামা ধর্ম, ক্রামাবর্ণমালা, মেনলে ম্রো, ক্রামাদি, অরিত্বরাওপরা, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন।

**[Abstract:** The Mro people are one of the prominent indigenous ethnic groups residing in the Greater Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, particularly concentrated in the Bandarban district. Like many hill communities, the Mro traditionally practiced their own indigenous or animistic religion. However, over time, changing circumstances have led to significant shifts in their religious beliefs. In recent years, the Mro community has embraced a newly founded religion known as the "Krama religion"**.** This article draws upon a

* সহযোগী অধ্যাপক, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পিএইচডি গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব দি ওয়েস্ট, যুক্তরাষ্ট্র। ই-মেইল: mdabu.taher@my.uwest.edu

wide range of sources, including books, scholarly articles, ethnographic studies, and interviews, to provide a comprehensive overview of the Krama religion. The primary objective of this article is to explore the origins, core beliefs, moral teachings, cultural practices, and the role of the founder, as well as the spread and influence of this emerging religious tradition among the Mro people.]

**ভূমিকা**

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি পার্বত্য অঞ্চল-বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলাসমূহে। অতীতে এই পার্বত্য অঞ্চলসমূহে ২০টির অধিক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী থাকলেও বর্তমানে চোখে পরার মতো সংখ্যা প্রায় ১১টি (চাকমা ও অন্যান্য (সম্পা.), ২০১৫, পৃ.৪৬৭)। এই সমস্ত নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ম্রো জাতিগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে এবং জীবনযাত্রার কৌশল ভিন্নতার এবং সাম্প্রতিক ধর্ম পরিবর্তনের কারণে আমাদের অনেকেরই কাছে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তবে পার্বত্য এলাকার এই ম্রো নামটির আবার ভিন্ন নামেও দেখা যায়, যেমন- মোরা, মরং, মুরং, ম্রং বা ম্রো। ম্রো বা মুরং কথাটি আদি ভাষা ‘টিপরা ভাষা’ হতে এসেছে (সিংহ, ২০০১, পৃ.৮৫)। যার অর্থ-গোত্র বা জাতি গোষ্ঠী। তবে এরা নিজেদেরেকে ‘মারুচা’ বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। মারুচা শব্দটি এসেছে ‘মারু’ থেকে। যার অর্থ মানুষ। ‘মারু’ শব্দ থেকেই ম্রো শব্দটি এসেছে বলে বেশির ভাগ ম্রো-আদিবাসী মনে করেন। অতীতে এরা মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও অনুমান করা হয় পরিবেশগত বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্যে বর্তমানে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার বান্দরবান অঞ্চলে বেশিরভাগই ম্রোরা বসবাস করছে। এ প্রসঙ্গে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বলেন,

> The Mrus (Murangs) is a tribe thatformerly dwelt in the Arakan hills; they now live principally to the west of the river Sangu and along the Matamuri river within the Chittagong Hill tracts. They assert that they were driven from Arakan by the existed between them and some few years ago, a bloody feud existed between them and affrays often took place….. The Murangs are tributary to the Bomong Raja” (Hunter, 1875, P.56).

স্যার অর্থার ফেইরি অনুরূপ একটি মন্তব্য উপস্থাপনা করেন। তিনি বলেন,

> “This is a hill tribe now much reduced from its ancient state. They once dwelt on the river Kuladan and its feeders, but have been gradually driven out by the Kami tribe. They have therefore

> emigrated to the West and occupy hills on the border between Arakan and Chittagong. The Radzaweng, or the history of the Arakanse kings, refers to this tribe as already in the country when the Myanmar (i.e., Burmese) race entered it. It also states that one of these tribes was chosen as King of Arakan in the Fourteenth century of the Christian era. The traditions recorded in the dame work also imply that the Mru and Myanmar races are of the same lineage, although this connection is denied by the Arakanese of the present day, who regard the Mru tribe as `wild men' living in a degraded state, end consider that it would be disgraceful to associate with them." (Phayre, 1883, p. 56)

অন্যদিকে স্যার অর্থার ফেইরি এর অন্য একটি লেখা থেকে জানা যায়, ম্রোরা আরাকানের খুমী উপজাতি দ্বারা বিতারিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। অতীতে বাংলাদেশের ম্রোদের মুরং এবং মায়ানমারের আরাকানের ম্রোদের 'মিয়ো' (গুঁ) বলে অভিহিত (চাকমা ও অন্যান্য (সম্পা.), ২০১৫, পৃ.৪৬৭)। তবে বর্তমানে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ি এলাকায় এদের সামান্য কিছু বসবাস করতে দেখা যায়। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী মুরংদের সংখ্যা ২২,১২৯ (বাতেন, ২০০৩, পৃ.২৪)। কিন্তু ১৯৯৫ সালে ম্রো সোসিয়েল কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত জরিপে ম্রোদের সংখ্যা ৫৯,৭৪৮ (প্রু, ১৯৯৬, পৃ. ৩-৪)। সর্বশেষ ২০১১ সালের বাংলাদেশ আদম শুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ম্রো বা মুরংদের সংখ্যা ৩৭,০৫৩ এর বেশি (শিশির, ২০০২, পৃ.৫)। ম্রোদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য থেকে নৃবিজ্ঞানীরা তাদেরকে মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেন। কারণ এরা মধ্যম আকৃতির এবং গায়ের রং হলুদ পীতাভ। লম্বাটে মুখমণ্ডল, কম দাঁড়িগোঁফ, ভাঁজযুক্ত পাতলা চোখের পাতা এবং মাথায় মোটা ও খাড়া চুল তাদের অন্যতম দৈহিক বৈশিষ্ট্য। ম্রোদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। তবে তারা বেশ কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত, যেমনঃ ভারুয়া, ভারিংচাহ, তাম-তুচাহ, প্রেনজু, নাইচাই ইত্যাদি (আহমেদ, ২০১২, পৃ. ১২৮)। ম্রো জাতিগোষ্ঠী অতীতে ধর্ম পরিচয়ে প্রকৃতি পূজা করলেও, পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক চাপে তারা সনাতন ধর্ম গ্রহণ করে। এরও অনেক পরে এই জাতির অনেকেই গৌতম বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষায় আলোকিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে অনেক ম্রো খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে (সাগর, ২০১০, পৃ.৩১৯)। ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝিতে (ম্রো, ২০১৫, পৃ.২৭) তাদের একজন ধর্মীয় নেতা মেনলে ম্রো একটি নতুন বর্ণমালা এবং এর সাথে 'ক্রামা' নামে একটি নতুন ধর্ম তাদের সমাজে তুলে ধরলে সাধারণ ও সহজ বোধগোম্যতার জন্য বেশিরভাগ ম্রো এই ধর্ম গ্রহণ করে। নিম্নে ক্রামা

ধর্মের নৃ-তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের একটি বিবরণ উপস্থাপিত হলো।

**নৃতাত্ত্বিক পরিচয়**

ম্রোরা নৃতাত্ত্বিক বিচারে মঙ্গোলিয়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং তিব্বতি-বার্মীজ (Tibote-Burman) জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ম্রো এর পূর্বনাম 'মুরং' শব্দের উৎপত্তির পিছনে একটি প্রচলিত উদ্ধৃতি রয়েছে। আরাকানে বর্মী ও স্থানীয় আরাকানীয়দের মধ্যে সহিংসতা বাঁধলে উভয় পক্ষ নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি জনগোষ্ঠীদের নিজেদের আয়ত্বে আনতে চেষ্টা করে। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পুরো আরাকান প্রদেশ রাজনৈতিক চরম সংকটে পতিত হয়। ফলে সেখানে সৃষ্টি হয় গোষ্ঠী দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ (কামাল এবং অন্যান্য (সম্পা.), ২০০৭, পৃ. ৪৬৮)। এই সুযোগে দুর্বল ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উপর শুরু হয় আক্রমণ ও সম্পত্তির লুটপাট। সে সময় ম্রোরা খুমি জনগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হয়। আরাকানের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই সময় আরাকানে কালাডন নদীর তীরদেশে ম্রো ও খুমীদের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। সেখানে ম্রোরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলে এদের একাংশ আরাকানের পশ্চিমে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে কখনো ম্রোরা বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষদের অর্থাৎ বাঙালিদের দেখেনি। আবার বাঙালিরাও কখনো ম্রো'দের দেখেনি। যার ফলে একে অপরকে দেখে উভয়ই বিস্মিত হয়। একে অপরের দেখা হলে, বাঙালিরা প্রশ্ন করে, তোমরা কারা? উত্তরে ম্রোরা বললো-"আঙ ইং সাদলত হনকা ওয়াং রুংমী ম্রো" অর্থাৎ আমরা সূর্যোদয়ের দেশ থেকে আগত মানুষ। বাঙালিরা না বুঝে পুনরায় প্রশ্ন করলো। তখন ম্রোরা বাক্যটিকে আরো সংক্ষিপ্ত করে বললো-"আঙ ইং ম্রো রুং" অর্থাৎ আমরা উদিত মানুষ। তখন বাঙালিরা 'ম্রো রুং' বাক্যকে উচ্চারণগতভাবে শুদ্ধরূপে বলতে না পেরে উচ্চারণ সুবিধার্থে 'মুরুং' বলে সম্বোধন করলো (Khan., 1998, P. 42)। তখন থেকেই অত্র অঞ্চলে তারা 'মুরুং' নামে পরিচিত হতে থাকে।

**ম্রো জনগোষ্ঠীর ধর্ম**

ম্রো রা সাধারণত প্রকৃতি পূজারি বা সর্বপ্রাণবাদী (সাত্তার, ১৯৭৫, পৃ. ৫৫)। অনেকে আবার সনাতন ধর্মের রীতিনীতিও অনুসরণ করে। পরবর্তীতে তাদের অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেও দেব-দেবীর পূজা করা থেকে সরে আসেনি। ম্রো উপজাতির সৃষ্টিকর্তার নাম 'তোরাই' (আহমেদ, ২০১২, পৃ.১২৯)। তাদের আরো দেবতা আছে, যেমন ওরেং, সুংতিয়াং ইত্যাদি। এদের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মূলত সর্বপ্রাণবাদ। এই সর্বপ্রাণবাদই মানুষের আদি ধর্ম এবং সর্বপ্রাণবাদই আদিম চিকিৎসাব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আদি যুগের মানুষ এভাবে প্রতিটি প্রাকৃতিক শক্তি বা বস্তুকে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি হিসেবে

মনে করতো। এ কারণে এ সকল শক্তিকে পূজা করার প্রচলন ঘটে। তবে ম্রো জনগোষ্ঠী বর্তমানে বিভিন্ন ধর্ম পালন করলেও এখনোও তারা প্রকৃতি পূজা করে। বিশেষ করে জুমচাষকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত দেবদেবীকে ম্রোরা পূজা করে যা বর্তমানে ম্রো সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। (বড়ুয়া, ২০০৬, পৃ.৫৬)। এছারাও কিছু ম্রো খ্রিস্ট ধর্মও গ্রহণ করেছে (উদ্দিন, ১৯৯৯, পৃ. ১২)। তবে সম্প্রতি ম্রো জনগোষ্ঠীর সাধক পুরুষ মেনলে, প্রথমে ক্রামা ভাষা, পরে "ক্রামা ধর্ম" প্রবর্তন করলে অধিকাংশ ম্রো "ক্রামা ধর্ম" গ্রহণ ও পালন করে আসছে এবং এই ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। "ক্রামা ধর্মের" ধর্মীয় গ্রন্থের নাম *রিয়ুং খতি*। এখানে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও জীবনব্যবস্থার নিয়মনীতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। সামাজিক ক্রিয়া-কর্তব্য অনুসারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের দেখা মেলে ক্রামা ধর্মের নির্দেশনায়। প্রতিটি গ্রামের নিয়ন্ত্রণ কাঠামোতে ছয়জন গুরু বা অরি-তরাউপ থাকে, যাদের উপর পৃথক কিছু দায়িত্ব অর্পিত। চখাং উপ-এর উপর ভেষজ চিকিৎসা, তরা উপ-এর উপর বিচার-সালিস এবং অরিপ উপ-এর উপর প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব। গ্রামের শিশুদের শিক্ষার জন্য সাংমি উপ, ধর্মবিষয়ক ব্যাখ্যা ও প্রচারের জন্য প্রসার উপ এবং গ্রামবাসীর জন্য আইন তৈরির দায়িত্ব অরি উপ-এর উপর। উল্লেখিত ছয়জন প্রভূত সম্মানীয় বলে পরিগণিত। ক্রামাধর্মের পবিত্রতম স্থান কিইয়ং বা বিহার, যা তিন অংশে বিভক্ত। ক্রামা ধর্মে ফুং বা চারিত্রিক আচার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সংসারধর্ম পালনকারী এবং সংসারত্যাগীর জন্য ফুং আলাদা। সংসারধর্ম পালনের জন্য আটটি ফুং প্রণিধানযোগ্য। যেখানে মদ পান এবং অন্যান্য নেশাদ্রব্য থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা বলা, জুয়াখেলা, প্রাণিহত্যা, লোভ-হিংসা, ব্যভিচার এবং মানুষের প্রতি কুদৃষ্টি প্রদান করাকে নিষেধ করা হয়েছে। সংসারত্যাগী কিংবা সন্ন্যাসীদের জন্য বাড়তি আরো দুই ফুং পালন করতে হয়। মানবিক সকল সম্পর্কের বাইরে থাকা এবং ভগবানকে একমাত্র আত্মীয় বলে গণ্য করা আর সেই সাথে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করা। এছাড়াও সবার জন্য রয়েছে বিশেষ নিয়ম অর্থাৎ ম্রোদের এই ধর্ম পালন করার অন্যতম কারণ হচ্ছে, এই ধর্মের ধর্মীয় মতবাদ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও নৈতিক শিক্ষার সহজবোধগম্যতা, যা পূর্বের ধর্মে অনুপস্থিত।

## মেনলে ম্রো'র পরিচয়

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের বান্দরবান শহরের অনতিদূরে ৪নং সুয়ালক ইউনিয়নে চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ী 'সিঅ' নদীঘেঁষে পোড়া পাড়া নামক গ্রামে ১৯৬৪ সালে মে মাসে কোন এক রবিবার পূর্নিমা রাতে ম্রো জাতির মুক্তির দূত মেনলে ম্রো জন্ম গ্রহণ করেন (ম্রো, ২০১৫, পৃ. ৩৪০)। তাঁর পিতার নাম মেনসিং ম্রো এবং মাতার নাম তুমতে ম্রো। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া মেনলেরা ছিল পাঁচ ভাই-বোন। তার ছোট দুই ভাই হলেন- কিরওয়ান ম্রো ও মেনয়া ম্রো এবং বোনদ্বয় হলেন- ওয়ানলং ম্রো ও তনরুং ম্রো। মেনলের

পিতা-মাতা গরীব হলেও তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে কোনো কিছুর জন্য অভিযোগ করতেন না। শৈশবকাল থেকেই মেনলে সৎ, বিনয়ী ও সত্যবাদী মানুষ ছিলেন। তিনি কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। ছোটবেলা থেকেহৈ তিনি চিন্তামগ্ন থাকতেন। বড় হওয়ার সাথে সাথে তিনি স্বল্পভাষী, আচার-ব্যবহারে অমায়িক, ভদ্র, নম্র, ক্ষমাশীল, নিষ্ঠাবান, সুশৃঙ্খল ও সাধাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কারো দুঃখ দেখলে তিনি কাতর হয়ে পরতেন। ছাত্রজীবনেও তিনি মেধাবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মেনলে'র বেশ কয়েকটি উপনাম ছিল, যেমন-ক্রংমিদি, অলংকেন, মাংত্বরা, অরাংসিংমাংইয়ুং। তবে 'ক্রামা ধর্ম' প্রবর্তন করেছিলেন বলে তাঁর অনুসারীরা তাঁকে ক্রামাদি বলে ডাকতেন। 'ক্রামাদি' শব্দের অর্থ প্রেরিত দূত। তিনি নিজেকে একজন ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলে দাবি করেন। মেনলে শুধু ধর্মই প্রবর্তন করেননি, তিনি ক্রামা বর্ণমালাও আবিষ্কার করেন। পরে তা ম্রো বর্ণমালা নামে পরিচিতি পায়। মেনলে তাঁর ভক্তদেরকে তাঁর উপদেশসমূহ বিভিন্ন গল্প, গান, কবিতা ও ছড়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন।

সামাজিক জীবনে যে বিষয়টি তাঁকে বেশি পীড়া দিত সেটি হল কুসংস্কার ও অজ্ঞতা। সমাজে বসবাসরত ম্রো জাতির লোকেরা নিজেদের বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হিসেবে দাবি করলেও আসলে তা ছিল বৌদ্ধ ধর্ম থেকে আলাদা। মূলত সেসময়ের ম্রোরা প্রকৃতি পূজাও করতো। ঠিক এই সময়েই মেনলে ধর্মহীন ও বর্ণমালাহীন ম্রো জাতিকে ধর্মের মাধ্যমে মন পবিত্র ও সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলেন। অন্যদিকে নিজস্ব বর্ণমালার মাধ্যমে গল্প, কবিতা ও গান রচনার মাধ্যমে ম্রো জাতিকে তিনি নৈতিক আর্দশ ও আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন।

## 'ক্রামা ধর্ম' প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

ক্রামা শব্দের অর্থ হলো সুনীতি অথবা সুবচনের সমন্বয়। এ ধর্মের মূলনীতি হল একতা, সততা ও নিষ্ঠা (চাকমা, ২০১৫, পৃ.৪৮৬)। এই ধর্ম সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন সাধু পুরুষ মেনলে। তাই অসীম জ্ঞানের অধিকারী মেনলেকে বলা হয় ক্রামা ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারী ও ভক্তরা তাঁকে সম্মান জানিয়ে অনেকে ক্রামাদিও বলে। মেনলে বা ক্রামাদি ছিলেন অনেক দূরদর্শী ও জ্ঞানের প্রতি অগাধ ভালোবাসা সম্পন্ন একজন মানুষ। ম্রো সমাজে 'ক্রামা' শব্দটি অনেক আগে থেকে বিদ্যমান থাকলেও এর ব্যবহার কিংবা এর অর্থ কেউ বুঝতে পারতো না। কারণ ক্রামা শব্দটি দিয়ে অসীম জ্ঞানের সাথে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী মানুষকে বুঝানো হতো। তাই মেনলে বা ক্রামাদি আসার আগে ক্রামা শব্দটি ম্রোদের মধ্যে থাকলেও এর ব্যবহার একেবারে শূন্যের পর্যায়ে ছিল। মেনলে পরবর্তীতে ক্রামা ধর্ম প্রবর্তন করে এর সঠিক অর্থ সকলের কাছে তুলে ধরলেন এবং পরিচিত করে তুললেন। ক্রামাদি ১৯৭৭ সালে ১২ বছর বয়সে নিজ গ্রামের একটি নিম্ন মাধ্যমিক আবাসিক

বিদ্যালয়ে নিজ আগ্রহে ভর্তি হলেন। এই স্কুলে আসার পূর্বে ক্রামা তাঁর নিজ গ্রামের কাতং ম্রোর কাছে মার্মা ভাষা শিখেছিলেন। মার্মা ভাষা শিখতে গিয়ে একটি জায়গায় তিনি পড়েছিলেন- 'যদি তুমি পবিত্র চিত্তে ভগবানকে স্মরণ কর এবং তাঁর কাছে কিছু চেয়ে থাক তবে ভগবান অবশ্যই তোমাকে তা দান করবেন' (আলম, ২০০২, পৃ. ৪১)।

এই কথাগুলো মেনলে এই স্কুলে এসেই বার বার দেখতে লাগলেন এবং পড়তে লাগলেন। এই কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই ক্রামাদির দিব্য দৃষ্টি খুলে গেল। তিনি দৃঢ় সংকল্পে আবদ্ধ হলেন যে, তাঁকে অবশ্যই কুসংস্কার ও অজ্ঞতার মধ্যে বাস করা ম্রো জাতির জন্য ভগবানের কাছে ধর্ম ও বর্ণমালা পবিত্র চিত্তে চেয়ে নিতে হবে। মেনলে যখন এই স্কুলে নিয়মিতভাবে পড়াশুনা করতে লাগলেন তখন শিক্ষকেরা বুঝতে পারলেন যে, ক্রামা সাধারণ মানুষ নন। কারণ অন্যান্য ছাত্রদের যেখানে কোনো পড়া বুঝতে ও পড়তে সপ্তাহখানেক লাগতো, সেখানে ক্রামাদির লাগতো কয়েক ঘণ্টা বা মিনিট। পরবর্তীতে ক্রামাদির এখানে বেশিদিন থাকার প্রয়োজন হয়নি। কারণ তিনি অল্প কয়েকদিনেই সেখানকার পাঠ শেষ করে ফেলেন। তাই আশ্রমের শিক্ষকরাও তাঁকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে ক্রামাদি বাড়িতে বসবাস করতে লাগলেন এবং বাবা-মাকে জুমের কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু সন্তানের পড়াশুনার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে গ্রাম থেকে দূরের একটি আবাসিক মাধ্যমিক স্কুলে ১৯৮২ সালের শুরুর দিকে তাঁর বাবা-মা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন। এখানকার গাছ-গাছালি ভরা সুন্দর পরিবেশ তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। পাশাপাশি তিনি এখানকার শিক্ষকদের অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি হয়ে উঠলেন স্কুলের একজন মেধাবি শিক্ষার্থী। সৎ ও বিনয়ী বলে শিক্ষকেরা তাঁকে অনেক স্নেহ করতেন।

এমনি করে এই স্কুলে থাকা অবস্থায় তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে স্কুলের পাশে জঙ্গলে গিয়ে একটি অশ্বথ গাছের নিচে ধ্যান করবেন। অতপর তিনি শুরু করলে ধ্যান। ধীরে ধীরে তিনি এই ধ্যানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। প্রথমে তিনি দিনে ধ্যান করলেও স্কুলের ক্লাশ ঘাটতি হয় বলে তিনি রাতে জঙ্গলে গিয়ে ধ্যান শুরু করলেন। কোনো কোনো দিন এই ধ্যান সন্ধ্যারাত থেকে ভোররাত পর্যন্ত চলতো। এরকম ধ্যান বেশ কয়েকদিন করার পর একদিন গভীর রাতে ধ্যানরত অবস্থায় তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। তিনি আলোকিত হলেন দিব্যজ্ঞানের মাধ্যমে। সেই সাথে একটি নতুন ভাষা, বর্ণমালা এবং একটি ধর্মের সন্ধান পেলেন। প্রথম অবস্থায় ধর্ম প্রচারের আগে তিনি এই নতুন ভাষাটিকেই আয়ত্ব করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মানুষকে ভাষা ও বর্ণমালার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তুললে তাকে সকল বিষয় সহজেই বোঝানো সম্ভব হবে। তিনি প্রায় দুই বছর এই ভাষাটিকে ভালোভাবে আয়ত্ব করে ১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে চিন্তা করলেন এই ভাষা বা বর্ণমালাসহ তাঁর প্রবর্তিত ক্রামা ধর্ম প্রচার করবেন (খান, ১৯৯৭, পৃ. ৭২)। প্রথমে তিনি

স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে গেলেন স্বর্গীয় দূতের অনুমতিক্রমে তিনি বর্ণমালা ও জগতের সকল মানব মুক্তির সনদ "ক্রামা ধর্ম" মানুষের কাছে প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু গ্রামবাসী তাঁর প্রচারিত "ক্রামা ধর্ম" ও বর্ণমালা বিশ্বাস তো করলেনই না বরং তাঁকে নানাভাবে হেয় করে অপবাদ দিতে লাগলেন। পাশাপাশি তাঁর প্রচারিত ধর্ম ও বর্ণমালা নিয়ে নানা রকম হাসি তামাসা করতে লাগলেন। তবে প্রথম দিকে মেনলের দুইজন কাছের বন্ধু তংক্লা ম্রো ও লাংপুং ম্রো "ক্রামা ধর্ম" সহজভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন (সাক্ষাতকার: ক্রামা ধর্মগুরু, মেন লু ং ম্রো)। পরে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ধর্ম প্রচারসহ বর্ণমালা শেখানের জন্য গ্রামে গ্রামে যাবেন। এই লক্ষ্যে তিনি প্রথমে রওনা হলেন ছাতং পাহাড়ে। সেখানে তিনি মেনঙি ও চ্যংঙাক ম্রো নামক আরো দুজন ব্যক্তিকে এ ধর্মের মর্মাথ বুঝাতে সক্ষম হন। এরপর সাতং পাড়া গ্রামে আরো দুজন ব্যক্তি কাতং ম্রো ও নেতখাই ম্রো এ ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে প্রথম চারজন "ক্রামা ধর্ম" গ্রহণকারীদেরকে নিয়েই তিনি পরবর্তীকালে এ ধর্ম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। মেনলে বর্ণমালা শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন রাতে আর ধর্ম প্রচার করতেন দিনে (সাক্ষাতকার:ক্রামা ধর্মগুরু, পুংজেং ম্রো)।

**"ক্রামা ধর্ম" প্রচার ও প্রসার**

মেনলে "ক্রামা ধর্ম" প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে তিনি জনসাধারণের মাঝে ক্রামাদি নামে পরিচিতি পেতে শুরু করলেন। তবে আদিবাসী গবেষক ও ভাষাবিদদের মতে ক্রামা বর্ণমালা থেকে "ক্রামা ধর্ম" নামের রূপান্তর হয়ে থাকতে পারে। যাইহোক, পরবর্তীতে ক্রামাদি বা মেনলে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম বা দিব্যজ্ঞান ও শিক্ষামালা প্রচার-প্রসারের জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। যে কমিটিতে বর্ণমালা বিষয়ের শিক্ষক হলেন নেতখাই ম্রো। মূল ধর্ম প্রচার কমিটির উপদেষ্টা হলেন রিংমন ম্রো। আর পুরো কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে থাকলেন ঊনআশি বছরের বৃদ্ধ সাংয়ং ম্রো (সাক্ষাতকার:ক্রামা ধর্মগুরু, মেনমিং ম্রো)।

সাতং পাহাড়ে ধর্ম প্রচারের পর ক্রামাদির নিজের গ্রাম পোড়া পাড়াতে ১০টি পরিবার "ক্রামা ধর্ম" গ্রহণ করেছিল। এরপর তাঁর গ্রামের তিন জন বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তি পরামর্শক হলেন। তারা হলেন- তংক্লাং, লাংপুং এবং ক্রামাদির পিতা মেনসিং। একই সাথে তারা "ক্রামা ধর্ম" প্রচার ও প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল (সাক্ষাতকার: ধর্মগুরু, মেনকোক)। এই ধর্মের সর্ব প্রথম বিহার নির্মাণ করা হয়েছিল চিম্বুক পাহাড়ের নীচে বাইট্যা পাড়াতে। কালক্রমে এই বাইট্যাপাড়ার পারাও ম্রো, লেংয়াং ম্রো, লিংক ম্রো এই তিনজন ব্যক্তি ক্রামাধর্মের প্রধান শিষ্য হলেন। পারাও ম্রো ক্রামাদির সর্বদা ডান পাশে এবং লেংয়াং ম্রো ক্রামাদির বাম পাশে বসতেন। ক্রামাদি পরবর্তীতে পারাও ম্রোকে তাঁর যাবতীয় করণীয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম বলতেন।

বাইট্যা পাহাড়ে বিহার নির্মাণের পর ক্রামাদি দ্বিতীয় বিহার নির্মাণ করেন নিজ গ্রাম পোড়া পাড়াতে। পরে ক্রামাদি আশেপাশের যে কয়েকটি গ্রামে লোক পাঠালেন, তাঁর জন্মস্থানে পোড়া পাড়াতে প্রথম "ক্রামা ধর্মের" সম্মেলন হওয়ার খবর জানিয়ে। ক্রামাদির খবর শুনে শত শত লোক পোড়া পাড়া গ্রামে জড়ো হওয়ার মনস্থির করলেন। অতঃপর ১৯৮৪ সালে এপ্রিল মাসের কোনো এক বৃহস্পতিবার ক্রামাদি তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম সম্পর্কে জনসম্মুখে প্রথম কথা বলা শুরু করলেন (সাক্ষাতকার: ধর্মগুরু, থৈয়ং লক ম্রো)। তাঁর ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য অনেক সহজ, সাবলীল ও স্পষ্ট হওয়ায় উপস্থিত জনগণ বেশিরভাগই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে তাঁর দুই শিষ্য রেংরাং ও সিংপ্রুয়াকে ক্রামা ধর্ম সম্পর্কে বলতে বলা হয়। কিন্তু সিংপ্রুয়া "ক্রামা ধর্ম" সম্পর্কে প্রথমে ভুলভাবে উপস্থাপনা করলে উপস্থিতির অনেকে অবাক হন। পরে ক্রামাদি তাঁর ভূল ধরিয়ে দিলে উপস্থিত জনগণ তা বুঝতে পারে এবং সিংপ্রুয়া জনগণের কাছে ক্ষমা চান (সাক্ষাতকার: কারবারী, পাটাশ ম্রো)। পরবর্তীতে সিংপ্রুয়া এই ধর্ম ও বর্ণমালার মর্মাথ হৃদয়ঙ্গম করে জনগণের উদ্দেশ্যে "ক্রামা ধর্ম" সম্পর্কে বলতে লাগলেন। সিংপ্রুয়া তখন আরো বললেন "ক্রামা ধর্ম" খাঁটি ধর্ম। "ক্রামা ধর্ম" অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে। আজকে যারা আপনারা এখানে এসেছেন আপনারা যাকে দেখবেন আর যার সঙ্গে সাক্ষাত হবে তাকে এই বর্ণমালা ও ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। আপনাদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে দিতে হবে ক্রামা ধর্ম ও বর্ণমালা। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে রেংরাং শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য। এমনি করে শেষ হয়ে গেল "ক্রামা ধর্মে"র প্রথম সম্মেলন। এরপর শুরু হলো গ্রামে গ্রামে ধর্ম প্রচার ও বর্ণমালা শিক্ষা। পরবর্তীতে ক্রামাদির উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের বান্দরবানের সাকসিং পাড়া, দিং পাড়া, ইয়াংরে পাড়া, প্রেমসাং পাড়া, মেনরই পাড়া,সাকরার পাড়া ও কেসফাই পাড়াসহ কেসফাই পাড়ার সীমান্তবর্তী দেশ মায়ানমারেও "ক্রামা ধর্ম" বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশের ম্রো উপজাতি ছাড়াও খুমী উপজাতির একাংশ ক্রামাধর্ম গ্রহণ করে (ত্রিপুরা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৯)।

## "ক্রামা ধর্মে"র নৈতিক শিক্ষা বা উপদেশসমূহ

ক্রামাদি বলেন, ভগবান পৃথিবীর সকল জীবকে সমানভাবে ভালোবাসেন। ভগবান সকল জীবকে ভালোবেসে তাঁর পথে নিয়ে যেতে চান কিন্তু সকল জীব ভগবানের পথে না গিয়ে খারাপ কাজে হাত বাড়ায়। ভগবান নির্দেশিত পথকে উপেক্ষা করে যারা মিথ্যা, চুরি, ব্যভিচার এবং অসৎ কাজে লিপ্ত থাকে। তখন ভগবান তাদেরকে নানান বিপদ ও কষ্টের মাধ্যমে শাস্তি দিয়ে থাকেন। ক্রামাদি মানুষের শরীরকে একটি খালি ঘরের সাথে তুলনা করেছেন এবং ঘরের মালিককে আত্মার সাথে তুলনা করেছেন। ঘরের মালিক যদি তার ঘরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন ও ঠিকঠাক করতে না পারে তবে কম সময়ে তার ঘর ভেঙ্গে যাবে। ঐ ঘরে কেউ থাকতে চাইবে না। ঝড়, বৃষ্টি, পানি ঐ ঘরে ঢুকে যাবে। আর যিনি তার

ঘরকে সঠিকভাবে দেখাশোনা ও মেরামত করবে তার ঘরে ঝড়-বৃষ্টির পানি ঢুকতে পারবে না। ঐ ঘর অনেকদিন টিকবে, সকলেই ঐ ঘরে থাকেতে চাইবে। সেরূপ ঘরের ন্যায় মালিকদের উচিৎ আত্মাকে পবিত্র রাখা ও ধর্মের নীতি মেনে চলা (সাক্ষাতকার: ক্রামা প্রধান ধর্মগুরু, মেনলোম ম্রো)। এভাবে ক্রামাদি অনেক নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশসমূহ ভক্তদের উদ্দেশ্যে দিয়ে গেছেন। তিনি সব উপদেশ আবার সমানভাবে লিখে যাননি। তিনি অনেক উপদেশ বক্তব্য,গল্প, কবিতা, ছড়া ও গানের মাধ্যমে বলে গেছেন। এমনি কয়েটি উপদেশমালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (সাক্ষাতকার: থোয়াইচিং ম্রো হেডম্যান)।

ক. সৎ চরিত্র গঠন:

যে কোনো কাজে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলেও শুধু চরিত্র খারাপের জন্য সাফল্য অনেক দূরে চলে যেতে পারে। তাই ক্রামাদি চরিত্রকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সমাজে চরিত্র 'ফুং' নামে পরিচিত। ক্রামাদি, চরিত্র বা 'ফুং' কে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যারা সংসার করবে তারা আটটি ফুং, আর যারা সংসার করবে না তাদেরকে দশটি ফুং পালন করতে হবে। আটটি ফুং বা চরিত্রগুলো হলো-

ক. মদ পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
খ. সিগারেট, গাজা, আফিম সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে।
গ. মিথ্যা কথা বলা, চুরি ও ডাকাতি থেকে বিরত থাকতে হবে।
ঘ. জুয়া খেলা থেকে বিরত থাকতে হবে।
ঙ. প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে।
চ. লোভ-হিংসা থেকে বিরত থাকতে হবে।
ছ. ব্যভিচার থেকে বিরত থাকতে হবে।
জ. কুদৃষ্টি দিয়ে মানুষের দিকে তাকানো বিরত থাকতে হবে।

ক্রামাদি বলেন, এই আটটি ফুং পালন করলে কোনভাবেই মানুষের অমঙ্গল আসতে পারবে না। সকল কাজে মানুষ সাফল্য লাভ করবে। ভয়, দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে যাবে। ইহলোক ও পরলোকে সুখী জীবন যাপন করতে পারবে। তাই সংসারী মানুষদের এই আটটি ফুং পালন করার জন্য ক্রামাদি বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেছেন।

এই আটটি ফুং ছাড়াও আরো আছে দশটি ফুং বা চরিত্র। তবে দশটি ফুং পালন করতে হলে তাকে সংসার ত্যাগ করতে হয় এবং সেই সাথে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করতে হয়। এছারাও তাকে ঐ চরিত্রগুলোর সাথে আরো কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন সে চুল, দাড়ি, নখ কাটতে পারবে না। তখন তাকে ভাবতে হবে তার বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী-পুত্র আর নেই। তার কাছে একমাত্র ভগবানই সব। ক্রামাদি বলেন, যদি

তার মনে ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে ভগবান তাকে সাহায্য করবে। তার মনোবাসনা ভগবান পূরণ করবেন। পূর্ণবিশ্বাস নিয়ে কাজ করলে, সাফল্য আসবেই।

খ. মানুষকে যত ক্ষমা করবে ভগবানও তাকে ততবার ক্ষমা করবেন

ক্ষমা প্রসঙ্গে ক্রামাদি একদিন তাঁর ভক্ত রেংরাংকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সন্তানের মতো মনে করে ভগবান মানুষকে অনেকবার ক্ষমা করতে পারেন। বিশেষ করে যে লোক মানুষকে যত ক্ষমা করতে পারবে ভগবানও ততবার তাকে ক্ষমা করে থাকেন। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি জীব ভগবানের সন্তান। পিতা-মাতা সন্তানদের যেরকম ভালোবাসেন ঠিক তেমনি ভগবানও পৃথিবীর প্রতিটি জীবকে ভালোবাসেন। তাই ভগবানের ভলোবাসা পেতে হলে অবশ্যই তাঁর সন্তানকে ভালোবাসতে হবে। তাঁর সন্তানদের ভালোবাসা মানে তাঁকে ভালোবাসা। তাঁর সন্তানদের ভাল না বেসে তাঁকে স্মরণ করলে তাতে ভগবান সন্তষ্ট হবেন না। বরং তাঁকে স্বরণ না করলেও তাঁর সন্তানদের ভালোবাসলে তাতে ভগবান সন্তষ্ট হয়ে যান। তাই ভগবানের ভালোবাসা পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো তাঁর সৃষ্ট জীবদের ভালোবাসা।

গ. প্রকৃত অর্থে কে ধনী লোক

ক্রামাদি বলেন, কারো কাছে কোটি কোটি অর্থ থাকলেও যদি সে সন্তষ্ট না হয় তবে তাকে ধনী লোক বলা যাবে না। ধনী লোক সেই যিনি যা অর্থ পায় তাতেই সন্তষ্ট থাকে (সাক্ষাতকার: মেন লু ং ম্রো , ক্রামা ধর্মগুরু)। সে যতটা পায় তাতে সন্তষ্ট, কারণ তার মধ্যে লোভ নেই। আর যতটা পায় তাতে যদি সন্তষ্ট না হয় তবে সে হবে লোভী। আর লোভের পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। তাই লোভ না করে যতটা পাবে তাতেই সন্তষ্ট থাকা উত্তম। কারণ সন্তুষ্টিই পরম তৃপ্তি।

ঘ. কীভাবে প্রার্থনা করলে ইচ্ছা পূরণ হবে

ধর্ম প্রচারের কাজে পাশ্ববর্তী বাইট্যা পাড়া গ্রামে একদিন ক্রামাদি ভ্রমণ করলে, সেখানকার এক অনুসারী নেতখাই ম্রো তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বলেন- কীভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে মনোবাসনা পূরণ হবে? উত্তরে ক্রামাদি বলেন-একজন সৎ কিংবা ভাল লোকের কাছে যদি কোনো গরীব লোক কিছু সাহায্য চেয়ে সাহায্য পায় এবং সেই সৎ লোকের কথা মেনে চলে, তবে সৎ লোকটি তার উপর খুশী হয় এবং তখন সে গরীব লোককে পরবর্তীতেও নানাভাবে সাহায্য করবে। আর একজন গরীব লোক যদি সেই সৎ লোকের কথা না মেনে চলে, বরং তার বিপক্ষে কথা বলতে থাকে, তবে সৎ লোক সাহায্য করা দূরে থাক, তার সংস্পর্শেও থাকতে চাইবে না। সেরূপ যদি কোনো লোক ভগবানের নির্দেশিত পথে চলে, তাঁর সৃষ্টি করা জীবদের ভালোবাসে তবে ভগবান তাতে সন্তষ্ট হয়ে তার মনোবাসনা বা ইচ্ছা পূরণ করবেন। অর্থাৎ তাঁর শিষ্যদের তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, প্রার্থনা করার সাথে প্রতিটি

জীবকে ভালোবাসলে, সৎ কাজ করলে এবং ভগবানের কথা মেনে চললে, সেই প্রার্থনা ভগবান পূরণ করবেন। পরবর্তীতে তিনি এই জন্মে এবং পরজন্মে সুখে শান্তিতে বসবাস করবেন।

ঙ. সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা

ক্রামাদি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মায়ানমারের একটি গ্রামের বিহারে রাত যাপন করলে এক ভিক্ষুক কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। এই প্রশ্নগুলোর একটি হলো, মহোদয় আপনি এই যে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এত বন-জঙ্গল, পাহাড়-পবর্ত, নদ-নদী অতিক্রম করলেন, আপনার সেখানকার হিংস্র জীবজন্তুর ভয় করেনি? উত্তরে তিনি বলেন, হে ভান্তে, আমি ঐসব হিংস্র পশু-প্রাণীর সামান্যও ভয় করি না। কারণ আমি পৃথিবীর প্রতিটি জীবকে খুব ভালবাসি। সকল প্রাণীর প্রতি আমি মৈত্রীভাব পোষণ করি। কোনো জীবের প্রতি আমার কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই। তাই পৃথিবীর সকল জীবও আমার ক্ষতি তো করেই না, বরং আমার উপকার করে থাকে। আসলে ভান্তে, আপনি যদি সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ও ভালবাসা পোষণ করে থাকেন, মনে সামান্যও ক্ষতি করার ইচ্ছা না থাকে, তবে কোনো প্রাণীই আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

চ. কবিতার মাধ্যমে ক্রামাদি অনেক উপদেশ লিখে রেখেছেন, যেমনঃ

অহংকার করতে নাই
অহংকার করে যদি কেউ বলে যে আমি যে কোনো কাজ করতে পারবো,
আমি পারবো।
তবে তার বিপদ হতে পারে।
যে গাছে উঠতে পারে না
অথচ পারবো বলে গাছে উঠে তবে
গাছ থেকে সে পড়ে যাবে।
তাই অহংকার করতে নাই।
মানুষের জীবন গাছের মতো

গাছ যখন ফুলে-ফলে ভরা
তখন গাছে কীট পতঙ্গ পাখির অভাব থাকে না।
কিন্তু যখন ফুল-ফল শেষ হয়
তখন ঐ গাছে কীট-পতঙ্গ ও পাখি থাকে না।
মানুষের জীবনও ঠিক তেমনি
মানুষের যখন খাবার টাকা-পয়সা থাকে

তখন তার বন্ধুর অভাব থাকে না।
যখন তার থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা থাকে না- তখন তার বন্ধুও থাকে না।
অভাবের সময় বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

রাগ করো না ঝগড়া করো না

ঝগড়া করা ভাল নয়।
ঝগড়াকারীকে বিপদে পড়তে হয়।
রাগান্বিত লোক পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ লোক।
যারা দুর্বলকে অত্যাচার করে
তাদেরকে ভগবান ভালবাসেন না।
তারা প্রথমে জিতলেও
পরিণামে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।
তখন মানুষ তাদের ঘৃনা করে।

ছ. গানের মাধ্যমেও ক্রামাদি উপদেশ দিয়েছেন:

বড় যদি হতে চাও
দিনে বাতি জ্বালাবে না
দিনে বাতি জ্বালালে
রাত আসতে কেরোসিন শেষ হয়ে যাবে।
প্রথমে যে বড়, শেষে সে ছোট হবে
প্রথমে যে ছোট, শেষে সে বড় হবে।
শেষে যদি বড় হতে চাও
তবে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে।
যদি বড় হতে চাও, তবে প্রথমে ছোট হতে হবে।
কষ্ট না করলে কোনো কিছুই পাওয়া যায় না।
এক স্থানে বসে থাকলে কোথাও পৌঁছানো যায় না।

স্বর্গ অনেক কাছে

স্বর্গ খুব দূরে নয়
স্বর্গ অনেক কাছে
যাদের মন সৎ ও পবিত্র

সকল মানুষসহ জীবকে যে ভালবাসে
যার আচার-আচরণ ভাল
তার কাছে স্বর্গ খুবই কাছে।
আর যে অসৎ ও অপবিত্র

মানুষকে হিংসা করে আর কষ্ট ও জ্বালা দিয়ে থাকে
খারাপ কাজে লিপ্ত থাকে সর্বদা
তার কাছে স্বর্গ অনেক দূরে।
নরক তার অনেক কাছে।

হে মানুষ শোন

পৃথিবীর মানুষ শোন,
আজ থেকে পৃথিবীতে
নতুন গান, নতুন ভাষা ও নতুন ধর্ম জন্ম হয়েছে।
এই ধর্মের নিয়ম-নীতি হলো
সকল মানুষকে ভালবাসতে হবে
সত্য কথা বলতে হবে,
বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর,
এই ধর্মকে বিশ্বাস কর, এই ধর্মের মূল কথা হল
সকল জীবকে ভালোবাস ।

### "ক্রামা ধর্ম" বিহার

"ক্রামা ধম" অনুসারে এটি তাদের প্রার্থনাকেন্দ্র এবং তাদের কাছে এটি একটি অত্যন্ত পবিত্র স্থান। বিহারকে ম্রো ভাষায় কিইয়ং বলে। এই কিইয়ং এর প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিকে অরিত্বরাওপরা বলে। এই পবিত্র বিহারে গিয়ে অরিত্বরাওপরা নিয়মিত প্রার্থনা করে। তবে একটি বিহারে একাধিক অরিত্বরাওপরা থাকে। বড় বড় বিহারে মোট ছয়জন অরিত্বরাওপরা থাকে। এই ছয়জনের প্রত্যেককে "ক্রামা ধর্মে"র নানা দায়িত্ব কর্তব্য ভাগ করা থাকে। অনুসারীদের মনে রাখতে হয় এই বিহারে ও বিহার এলাকায় তাদের পান-সুপারি, মদ, সিগারেটসহ যে কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। এই বিহারের মূল ভবনটি তিন ভাগে বিভক্ত-প্রার্থনার স্থান, অরিত্বরাওপরাদের থাকার স্থান এবং সাধারণ ভক্তদের বিশ্রামের স্থান। অরিত্বরাওদের থাকার স্থানকে ম্রো ভাষায় *রিয়াখেপ কিম* বলে, আর প্রার্থনা করার ঘরকে তারা *সোলুকরা কিইয়ং* এবং বিশ্রামের স্থানকে *নাংখর* বলে। নাংখর এ কোনো দেয়াল থাকে না। মূলত এটি উঠান বা বারান্দার মতো। বিহারের ভিতরের সোলুকরা কিইয়ং

স্থানে দুটি ভাগ থাকে। এই স্থানের বাম দিকে পুরুষ এবং ডান দিকে মহিলারা বসে প্রার্থনা করে। মাঝখানে একটি পথ রাখা হয় অরিত্বরাওদের যাওয়া-আসার জন্য। মহিলা ও পুরুষের বসার স্থানকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়। যেমন যাদের বিবাহ হয়েছে, তারা অরিত্বরাওপরাদের সামনে বসবে আর যাদের বিয়ে হয়নি তারা পিছনে বসবে। প্রার্থনার সময় তারা একজন আরেকজনকে স্পর্শ করতে পারবে না, এমনকি কোনো কথা বা হাসাহাসি করতেও পারবে না।

বিহারে যাওয়ার পথকে তারা ধাপে তৈরী করে এবং এই ধাপ তৈরী হয় বাঁশ দিয়ে। এই ধাপে সামান্য করে পথ রাখা হয় বিহারে যেতে। তবে ভক্তদের মনে রাখতে হয় ঐ বাঁশের উপর তাদের পা স্পর্শ করা মানা। তারা মনে করে কোনো কারণে ঐ বাঁশের উপর পা স্পর্শ হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। তখন তাকে আরেকবার তাংফুং অনুষ্ঠান করে ভগবানের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। বিহারে অরিত্বরাওপরাদের সামনে আলমারি থাকে, যেখানে ফুল সাজানো থাকে এবং ঐ আলমারিতে টাকা-পয়সা ও দানের জিনিস রাখা হয়। এই আলমারি আবার উপরনিচ দুই তাক বিশিষ্ট। কারণ দান দেয়ার সময় নিচের তাকে ভক্তদের রাখতে হয়, পরে অরিত্বরাওপরারা এই দান উপরের তাকে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখে।

বিহারের ভিতরে একটি ঘণ্টা ঝুলানো থাকে। প্রতিটি পর্বে এই ঘণ্টাগুলো বাজানো হয়। ঘণ্টা দেয়ার নিয়ম হলো প্রথমে অরিত্বরাওপরাদের যেকোনো একজন বা দুইজন বিহারে গিয়ে পনেরোবার ঘণ্টা বাজাবেন, এরপর তারা প্রার্থনা শুরু করবে। প্রার্থনা করার সময় গ্রাম থেকে যারা বিহারে যাবে তারা বিহারের বিশ্রাম করার জায়গায় জমায়েত হবে। পরে তাদের প্রার্থনা শেষ হলে বিহারের দরজা খুলে দিবে এবং সাতবার ঘণ্টা বাজাবে। ঘণ্টা বাজানোর পর যারা বিশ্রামের জায়গায় ছিল তারা সবাই পা ধুয়ে বিহারে উঠে যার যার স্থানে বসবে। পরবর্তীতে সবাই যখন উঠে যাবে তখন দরজা বন্ধ করে দিবে এবং তখন তিনবার ঘন্টা বাজাবে। এরপর শুরু হবে প্রার্থনা। প্রথমে যারা দান করবে তাদেরকে আর্শীবাদ দিয়ে দেবে অরিত্বরাওপরা। এরপর অরিত্বরাওপরারা সকলকে উপদেশ দিবে। উপদেশ পর্ব শেষ হলে শুরু হবে প্রার্থনা পর্ব। প্রার্থনা পর্ব আবার দুইভাগে বিভক্ত। প্রার্থনা পর্ব শেষ হলে দুইবার ঘণ্টা দিয়ে বিহারের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং প্রথমে মহিলা এবং পরে পুরুষ বিহার থেকে বের হবে। বিহার থেকে বের হওয়ার পর মহিলারা একে অপরকে এবং পুরুষরা একে অপরের হাত ধরে সম্মান জানাবে। তারপর তারা যার যার গ্রামে চলে যাবে। তবে যাওয়ার সময় মহিলারা মহিলাদের যাওয়ার পথে, পুরুষেরা পুরুষদের যাওয়ার পথে এবং অরিত্বরাওপরা নিজেদের পথে যাবে। "ক্রামা ধর্মে" বিহারে যাওয়ার জন্য আলাদা আলাদা তিনটি পথ থাকে। বিহারে যাওয়ার বামদিকের পথ পুরুষরা ব্যবহার করতে

পারবে। ডানদিকের পথ ব্যবহার করবে মহিলারা আর মাঝখানের পথ ব্যবহার করবে অরিত্বরাওপরা। অরিত্বরাওপরারা ম্রো সমাজে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত।

## "ক্রামা ধর্মে" প্রার্থনা

"ক্রামা ধর্মে" অরিত্বরাওপরারা নিয়মিতভাবে বিহার ও বিহারের বাইরে প্রার্থনা করে। তবে সাধারণ ভক্তরাও বিহারে ও তাদের বাড়িতে নিয়মিত প্রার্থনায় অংশ নেয়। এ ধর্মের অনুসারীরা প্রার্থনার শুরুতেই তাদের ভাষায় বলে-'*থোরাই ক্রংমিদি থানানি, প্রোকঙরে রওয়াইক*'। যার অর্থ হলো- হে ভগবান আমার সমস্ত পাপগুলো মুছে যাক। এই কথা বলার পর তাদেরকে নিজের ইচ্ছামত প্রার্থনা করতে হয় এবং যখন এটি শেষ হবে তখন তাদের বলতে হয়-'*থোরাই হাংপিয়া তিথান সোঙাক তইমইয ক্রুপ, সো ইয়ুং তই মইয় পকা, নাওদই সোঙাক, নাওচিং সোইয়ুং থোরাই এন সোলেং মইয পকা, থোরাই সোচুর প্রাসি ক্রমাদি মিংসাই সাইনসা চক্রা এন চেন চো*'(সাক্ষাতকারঃ ইং ওয়াই ম্রো, 'ক্রামা ধর্মা'নুসারী)। এর অর্থ হলো- হে ভগবান আমাকে ভাল হতে সাহায্য করুন। প্রার্থনা ভুল হলে মাফ করবেন। খারাপটি বাদ দিয়ে ভালটা যেন পাই, খারাপ চাই না, ভাল গুলো দিয়ে দিবেন। আপনার আর্শীবাদ সর্বদা কামনা করছি, শেষেও ভগবানকে স্মরণ করছি। যে কোনো ক্রামাভক্ত অরিত্বরাওপরার কাছে দোয়া চাইলে, তখন অরিত্বরাওপরা এরকম দোয়া দিয়ে বলবে- '*থোরাই চক্রামাং, দকামাং প্রাইংমামাং, অক্রামা, কোকরাক, আরাক, কোকদামরা, উয়ু, অরাক, বিংবাং থানানি অপ্রেকরি, ঙাকমইয় কমরা সাংক্রাং ক্রুকলট তপ্রাং তখাম*'(সাক্ষাতকারঃ ইং ওয়াই ম্রো, 'ক্রামা ধর্মা'নুসারী)। এটি বলার পর অরিত্বরাওপরাকে ধন্যবাদ দিতে হয় দোয়া প্রার্থী ভক্তকে। ক্রামাদি বলেন, প্রার্থনা মনকে শক্তিশালী করে। মনের দুঃখ-কষ্ট ও ভয়-ভীতি দূর করে মনে সাহস যোগায়। প্রার্থনা ছাড়া কারো মন পবিত্র থাকতে পারে না। তারা মনে করে মনকে পবিত্র রাখতেই প্রার্থনা করা অত্যন্ত জরুরী।

## "ক্রামা ধর্ম" এর উৎসবসমূহ

ক্রামা সমাজ পুরো একটি বছর প্রধান চারটি ধর্মীয় উৎসব পালন করা হয় (সাক্ষাতকারঃ ইং ওয়াই ম্রো, ক্রামা ধর্মানুসারী)। প্রতিটি উৎসব তিন দিন স্থায়ী থাকে। উৎসবের দিন এই ধর্মের অনুসারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, আবাল-বনিতা সকলেই ধর্ম উপাসনালয়ে যায় এবং সেখানে সমবেত হয়ে সকাল, দুপুর, বিকাল ও রাতে চার তিথির প্রার্থনা সভার আয়োজন করে। উৎসবগুলির অন্যতম হল- প্রাতলা পয়, সুরাইলা পয়, রামমোলা পয় এবং লুতলা পয়। ক্রামা এই উৎসবগুলোর প্রতিটিতে মোট তিন দিন ধার্য করা থাকে। এই তিন দিনকে তাদের ভাষায় তউং দিন বা 'ধর্ম দিন' বলে। তউং শব্দের অর্থ হিসেবে কোথাও না যাওয়াকে বোঝায়। কোনো প্রয়োজন ছাড়া সাধারণত এই তিন দিনে বা ধর্ম দিনে তারা কোথাও যায়

না। এমনকি প্রাণীহত্যাসহ অন্যান্য কাজ করাও তাদের বিরত থাকতে হয়। তিন দিনের প্রথম দিনে তারা নিজ বাসস্থান থেকেও বের হয়না। 'ধর্ম দিন' এর পূর্বদিনকে তারা '*ঙারসাত*' দিন বলে। এই দিনে ক্রামাসমাজের প্রতিটি পরিবার তাদের নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী গরু, মুরগী বা শুকর জবাই করে ভাল ভাল খাবার রান্না করে রাখে। যেন 'ধর্ম দিন' এর সময়গুলোতে তারা সেগুলো খেতে পারে। 'ধর্ম দিন' এর তিন দিনে প্রতিদিন তিনবার বিহারে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়। এই সময় বিহারে সর্বদা ধর্মীয় সাধক ব্যক্তি থাকে। ধর্মীয় ভাষায় তারা তাদেরকে '*অরিত্বরাওপরা*' বলে। এই ধর্মের অনুসারীরা এই ধর্ম দিনের তিন দিনেই তিনবার করে 'অরিত্বরাওপরা'দের বিহারে গিয়ে ভাত-তরকারী দান করে। ধর্মীয় এই কাজটিকে তারা তাদের ভাষায় বলে *কাইকসন*। প্রার্থনার সময় এবং *কাইকসনের* সময় অরিত্বরাওপরারা ঘণ্টা বাজিয়ে আগ্রহী অনুসারীদের স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে।

'প্রাতলা পয়' উৎসব বছরের এপ্রিল মাসে হয়ে থাকে। 'প্রাত' শব্দের অর্থ আমের বীজ শক্ত হয়ে যাওয়া এবং 'লা' শব্দের অর্থ মাস। অর্থাৎ 'প্রাতলা' শব্দের অর্থ আমের বীজ শক্ত হয়ে যাওয়ার মাস। এপ্রিল মাসেই ক্রামাদি প্রর্বতন করেন তাঁর ধর্মমত ও বর্ণমালা এবং এই মাসেই তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। তাই এই মাসের এই তিন দিনকে তারা অত্যন্ত পবিত্র দিন হিসেবে গণ্য করে। প্রাতলা উৎসবের তিন দিনে তারা বিহারে গিয়ে প্রার্থনা, ভোজ ও আনন্দ উৎসব করে।

এই ধর্মের অনুসারীদের দ্বিতীয় প্রধান উৎসবের নাম 'সুরাইলা পয়'। 'সুরাইলা' শব্দের অর্থ মে মাসের উৎসব। "ক্রামা ধর্ম" অনুসারে এই মাস হল বছর শুরুর মাস। তাই নতুন বছরকে বরণ করার জন্য মে মাসে উৎসব করা হয়ে থকে। এরপর তৃতীয় উৎসবটি হচ্ছে 'রামপোলা পয়'। এর অর্থ হচ্ছে জুলাই মাস। এই জুলাই মাসে ক্রামাদি কঠোর সাধনার উদ্দেশে সংসার ত্যাগ করেছিলেন বলে স্মরণীয় ও পবিত্র হিসেবে মনে করে উৎসব করা হয়।

এই ধর্মের অনুসারীদের চতুর্থ বৃহত্তম উৎসবের নাম 'লুতলা পয়' উৎসব। যেটি সম্পন্ন হয় অক্টোবর মাসে। 'লুতলা পয়' শব্দের অর্থ অক্টোবর মাস। এই মাসের আগে জুমের পাকা ধান কাটা শেষ হয়ে নতুন ধান পাওয়া যায়। তাই পুরোনো বছরের দুঃখ কষ্টকে ঝেড়ে ফেলে আনন্দ করাই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। নতুন ধান যখন ঘরে ঘরে ধানের গোলায় ভরপুর হয় তখনই এই লুতলা পয় উৎসব হয়ে থাকে। বছরের চারটি উৎসবের মধ্যে লুতলা পয় হলো সবচেয়ে আনন্দমুখর উৎসব। অন্য তিনটি উৎসবে যদিও বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যায় না তবে লুতলা পয় উৎসবে ধনী, গরীব সকলেই তিন দিন করে বিশ্রাম করে ও বিহারে গিয়ে প্রার্থনা করে থাকে। লুতলা পয় উৎসবে বিহারে গিয়ে লোকজন জুমের নতুন ধান থেকে শুরু করে জুমের নানা ফসল ও ফলমূল দান করে থাকে। তাই "ক্রামা ধর্ম" অনুসারীদের নিকট

লুতলা পয় একটি অন্যতম আনন্দের উৎসব হিসেবে পরিচিত। যারা “ক্রামা ধর্ম” পালন করে তারা উৎসবে কোনো প্রাণীহত্যা করে না। উৎসব ছাড়াও তারা সপ্তাহের রবিবার ও বৃহস্পতিবার কোনো প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকে। কারণ তারা মনে করে রবিবার ক্রামাদি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ও গৃহত্যাগ করেছিলেন। আর বৃহস্পতিবার ক্রামাদি বর্ণমালা প্রকাশ করেছিলেন। রবিবার ও বৃহস্পতিবার হলো বিশ্রামের দিন। রবিবার কোন ভাবেই এ ধর্মের অনুসারীরা বাইরে কাজ করতে যায় না। এই দিনকে তারা অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। এই দিনে তারা দিনে তিনবার, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় বিহারে গিয়ে প্রার্থনা করে।

**ম্রোদের লোকজ ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারসমূহ**

**ক. গো-হত্যা অনুষ্ঠান**

ম্রো সমাজের অন্যতম লোকজ সামাজিক উৎসবের নাম গো-হত্যা বা ছিয়াছত প্লাই উৎসব। ‘ছিয়া’ অর্থ গরু আর ‘ছত’ অর্থ বল্লম দিয়ে হত্যা করা। ‘প্লাই’ শব্দের অর্থ নৃত্য করা। জুমচাষ শেষে ফসল তোলার পর অবস্থাসম্পন্ন ম্রোরা এই উৎসবের আয়োজন করে থাকে। গো-হত্যা অনুষ্ঠান ম্রো সমাজের সর্ববৃহত লোকজ ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক অনুষ্ঠান (হক, ১৯৯৯, পৃ. ২৩)। জুমচাষ ছাড়াও ম্রো’রা গৃহের রোগমুক্তি কামনায়, গৃহ শান্তি ও উচ্চ ফলনের আশায় ‘থুরাই’কে (সৃষ্টিকর্তা) উদ্দেশ্য করে মানত করা উপলক্ষ্যেও এই পূজা করে থাকে। সাধারণত এই উৎসব আয়োজন করা হয় ডিসেম্বর, জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ যখন ম্রোদের বাৎসরিক ফসল উত্তোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। গ্রামবাসীর পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি (রিয়াচাওয়া) উক্ত অনুষ্ঠানের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে।

অনুষ্ঠান আয়োজন এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে বাঁশ ও ‘ছিট’ (এক প্রকার ফুল) সংগ্রহ করে। এই ছিট দিয়ে গ্রামের মধ্যখানে ‘লিম্পুতে’ মাচাং সাদৃশ্য একটি পাটাতন তৈরি করা হয়। এর নিচে গরু বাধার জন্য পিঞ্জরের সাদৃশ্য একটি ঘর তৈরি করা হয়। অনুষ্ঠানের দিবসে সন্ধ্যায় ঘরে গরু বাঁধানো হয়। অন্যদিকে অনুষ্ঠান আয়োজনের একদিন আগে যুবক-যুবতীরা অরণ্য হতে বুনো কলাপাতা সংগ্রহ করে। যে কোনো অনুষ্ঠানে ম্রোরা কলাপাতার উপর খাবার সাজিয়ে পরিবশেন করে। অনুষ্ঠান আয়োজনের এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে আত্মীয়-স্বজনদের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। জামাই গোষ্ঠীর লোকেরা খাঁচায় ভরা মোরগ-মুরগি নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসে আর মামার গোষ্ঠীর লোকেরা শূকরের মাংস, হাঙ্গর মাছের শুঁটকি নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করে। প্রথম দিনে আমন্ত্রিত অতিথিদের সামাজিকভাবে আপ্যায়ন করাতে হয়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমন্ত্রিত অতিথি, স্বগোত্রীয় লোকজন, নিকট আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীরা অনুষ্ঠান আয়োজককারীদের সন্মান স্বরূপ এক বোতল মদ উপহার হিসেবে প্রদান

করে। তখন মদ্যপানের আসরে বসে। ম্রো ভাষায় এ আসরকে বলা হয় 'তা-অই'। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সবাই এই আসরে শরিক হতে পারে, তাতে কোনো বাধা নিষেধ নেই। এ আসর সমাপ্ত হলে শুরু হয় নৃত্যানুষ্ঠান। পরের দিন গো-হত্যার দিন সকালে গৃহকর্তা এক হাতে ধারালো বল্লম আর মুখে আদার জল পুড়ে গরুর গায়ে ফুঁ দেয় এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে। 'হ থুরাই আজ তোমার মানত করা গো হত্যার আয়োজন করেছি। আজ থেকে যেন আমার গৃহ লোকের কোনো রোগব্যাধি না হয়।' ইত্যকার মন্ত্র পড়ার শেষ হওয়ার সাথে সাথে ডান পার্শ্ব হৃদপিন্ড বরাবর বল্লম দিয়ে খোঁচা দেয়। মৃত্যুর জন্য গরু ছটপট করলে বল্লম দিয়ে জিহ্বা বের করে কেটে 'লিং' (গরুর বাধার খুঁটি) এর উপর গেঁথে রাখা হয়। গো-হত্যা শেষে গরুর মাংস রান্না করে পরিবারের সকলেই আহার করে। সন্ধ্যা হলে পুনরায় যুবক-যুবতীরা খানী পিঞ্জরের চত্তরে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। ঘুরে ঘুরে নয়বার নৃত্য পরিবশেন করার পর তারা আয়োজকের গৃহে অবতরণ করে নৃত্যের সমাপ্তি ঘটায়। আমন্ত্রিত অতিথিরা গো-মাংস নিয়ে যার যার ঘরে ফিরে যায়।

"ক্রামা ধর্ম" আবিষ্কার ও বর্ণমালা আবিষ্কারের পর বর্তমানে ক্রামা ধর্মাবলম্বী গো-হত্যা পরিত্যাগ করেছে (সাক্ষাতকার: বেইংক ম্রো, কারবারী)। যার কারণ বর্তমানে গো-হত্যা দিবস কমে গেছে। ধর্ম ও বর্ণমালা প্রাপ্ত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বর্তমানে ক্রামা ধর্মাবলম্বীদের কাছে গরু হত্যা আর প্রয়োজন মনে করছে না।

**খ.খাং পূজা**

'খাং' তাদের অরেকটি লোকজ ধর্ম পূজা। 'খাং' শব্দের অর্থ সাধারণত 'পরিশুদ্ধিতা' বোঝায়। আবার পবিত্রতাও বলা যায়। যার কারণে খাং অনুষ্ঠানের আয়োজনের দিনে পাড়ার সমস্ত প্রবেশদ্বার বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে বিশেষ নিয়মে পরিশুদ্ধতা করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু থেকে মোট তিনদিন কেউ পাড়ার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। এমনকি কোনো বিশেষ কারণে পাড়ার লোক বাইরে গেলে খাং এর নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে না ফিরলে তাকেও খাং শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাড়ার ভেতর প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। খাং বছরে দুইবার যথাক্রমে ১. বতথক খাং (শুষ্ক মৌসুমে পূজা) ও ২. ডসয়দং খাং (বর্ষা মৌসুমে পুজা) আয়োজন করা হয়। কতথক খাং পূজার (শুষ্ক মৌসুমে পূজা) আয়োজন করা হয় শুষ্ক মৌসুমে। জুম চাষ শুরুর প্রাক্কালে বাৎসরিক কাজের শুভ-কামনার উদ্দেশ্যে এ পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। জুম চাষ শুরু হওয়ার পর ম্রোদের তেমন বিশ্রামের সময় থাকে না । একটানা বাৎসরিক ফসলের উত্তোলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাজে হাত দিতে হয় না। এই দীর্ঘ পরিশ্রান্ত কাজ করার সময় যাতে কোনো বিপদ আপদ না আসে, কোনো দুর্ঘটনা এবং রোগ-ব্যাধিতে না ভোগে সে উদ্দেশ্যে মূলত বতথক খাং আয়োজন করা হয়। সিয়াদং খাং পূজা (বর্ষা মৌসুমে পূজা) শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান

আয়োজনের প্রস্তুতি বতথক খাং এর মতোই। জুমের ধান, তুলো, তিশি, গুইসা, বরবটি, ঢ্যারস, কুমড়ো প্রভৃতি ফসল যাতে অকালে ঝরে না পড়ে সে উদ্দেশ্যে সিয়াদং খাং আয়োজন করা হয়।

**আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা**

বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকার বান্দবান জেলার আলীকদম নামক থানার মোট তিনটি গ্রামে (মেরিং চর কেংকো ম্রো পাড়া, জালানী পাড়া, কাইমেন ম্রো পাড়া), ৬-৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখের মাঠ পর্যারের গবেষণায় তাদের আর্থ-সামাজিক সমীক্ষায় তাদের পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক চোখে পড়ে। বিশেষ করে ধর্ম পরিবর্তনের আগে ও পরে তাদের জীবন মান ও বৈচিত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা চোখে পড়ার মতো। ম্রোদের গ্রামগুলোতে সরজমিনে গিয়ে যে উপলব্ধি হয়েছে, তা হলো তাদের অর্থনীতি প্রধানত আত্নপোষণমূলক অর্থনীতি। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তারা ফসলাদি উৎপাদন করে। তবে আজকাল ম্রোরা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও ফসল উৎপাদন করে। বিশেষ করে বিভিন্ন ফলমূল যেমন কলা, আদা, হলুদ, তিল, যব, কাঠাঁল, পেঁপে, মিষ্টি আলু ইত্যাদি উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করে। ম্রোরা সাধারণত পাহাড়ের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। দুর্গম ও ভঙ্গুর পথ পেরিয়ে বাজারে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিয়ে আসাও তাদের জন্য প্রায়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার ম্রোরা যা উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে আসে, তার সঠিক দামও পায় না। উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজার দর না জানা এবং এতদঅঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য সমতলের বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে অন্যান্য আদিবাসী কৃষকের মতো ম্রোরাও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি তারা বাঙালি ব্যবসায়ীদের নানা ধরনের প্রতারণারও শিকার হয় (সাক্ষাতকারঃ মং খিং মারমা, শিক্ষার্থী)।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত ম্রো আদিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। বর্তমানে আগের মতো জুমচাষও লাভজনক নয়। সেই সাথে এখন জুমচাষে খরচের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ঘাটতি পূরণ করতে ম্রোদের মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হতে হয় এবং তারা চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। এভাবে ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে ম্রোরা গরীব থেকে আরোও গরীব হচ্ছে। এছাড়াও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্রতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ, চিরায়ত জুমভূমি সংকুচিত হয়ে আসা।

ম্রো জনগোষ্ঠীর ভূমির ব্যবস্থাপনা বহুমাত্রিক ও সামাজিক। ম্রো সমাজে ব্যক্তি মালিকানা বা বন্দোবস্তীকৃত ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। হাতেগোনা কয়েকজন ম্রো পরিবার ছাড়া বাকি অধিকাংশ ম্রোদের নিজ নামীয় ভূমির বন্দোবস্ত নেই বললেই চলে। নিজস্ব নামের ভূমির বন্দোবস্ত না থাকলেও ম্রোরা নিজেদেরকে ভূমিহীন ভাবে না। প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদকে তারা নিজেদের সম্পদ বলে মনে করে। যে অঞ্চলে তারা বসবাস করে সে

অঞ্চলকে পাড়াবাসী সবাই মিলে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা দিয়ে চৌহদ্দিভূক্ত করে রাখে। তারা মনে করে সেটাই তাদের সমষ্টিগত ভূমি। 'থরাই' (সৃষ্টিকর্তা) ছাড়া কেউ ভূমি দান করতে পারে না। তাদের এই ধারণা বর্তমানে তাদেরকে বাস্তুহারা করে দিয়েছে। ম্রো জনগোষ্ঠীরা গোত্রভিত্তিক এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বাস করে। যার ফলে ভূমি নিয়ে তাদের কোনো বিরোধ থাকে না।

প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনার ফলে ম্রো'রা তাদের সরকারি অফিসে ভূমি রেজিস্ট্রেশনের তাগিদ অনুভব করে না। তাদের অধিকাংশ বাস্তুভিটা ও বাগান-বাগিচার ভূমি বন্দোবস্তহীন। তারা এসব ভূমি বংশ পরম্পরায় ভোগদখল করে আসছে। কিন্তু তাদের সেই প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনা ও অধিকারকে হরণ করে তাদেরই আবাসভূমিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি অভিবাসন, নানা প্রকল্পের নামে ভূমি অধিগ্রহণ, বন বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা, অস্থানীয়দের নিকট ইজারা দেয়া ইত্যাদি কারণে তারা তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে অনেক ম্রো গ্রাম পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সরকারি বন্দোবস্ত না থাকায় তাদের গ্রামগুলোতে ইতিমধ্যে হাটবাজার ও অফিসাদি গড়ে উঠেছে। ফলে বাস্তুভিটা ছেড়ে তারা অন্যত্রে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে স্থানীয় শিক্ষার্থী মং খিং মারমা এর সাক্ষাতকার হতে জানা যায় যে, বান্দরবানের লামা বাজারকে ম্রোরা 'কারা চি' বলে। অর্থাৎ কারা বাজার। 'কারা' একজন মানুষের নাম। আর 'চি' শব্দের অর্থ বাজার। লামা বাজার স্থাপিত হওয়ার অনেকদিন আগে বর্তমান লামার মুখ বাজার সংলগ্ন এক হাজার পরিবার নিয়ে একটি ম্রো গ্রাম ছিলো। পরবর্তীতে মাতামুহুরী নদীর পথ দিয়ে সমতল থেকে কয়েকজন বাঙালি সেখানে আসে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তখন থেকে সেখানে ক্ষুদ্রাকারে বাজার গড়ে উঠে। এভাবে এক পর্যায়ে লামা বাজার বৃহৎ আকারে গড়ে উঠে এবং বর্তমান লামা উপজেলার সদর দপ্তরও এখানে স্থাপিত হয়। ফলে উক্ত কারা গ্রামের ম্রো পরিবারগুলো পরবর্তীতে মাতামুহুরী নদীর উজানে বর্তমানে রূপসী ইউনিয়নের চিংখুম পাড়ায় স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়।

এছাড়া আমতলী পাড়া নামে ম্রো'দের এক বৃহৎ গ্রাম ছিলো। স্থানীয় ম্রোরা এ গ্রামকে শহরের সাথে তুলনা করে 'ম্রো দম কোয়া' অর্থাৎ শহরের গ্রাম বলতো। এ গ্রামে প্রায় এক হাজার ম্রো পরিবার ছিলো বলে জানা যায়। মুক্তিবাহিনীর আশ্রয় কেন্দ্র বলে মনে করে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধচলাকালীন এ গ্রামকে পাকবাহিনী আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে (ভৌমিক ও ধর, ১৯৯০, পৃ. ৪৮৩)। তখন বহু ম্রো পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। পাকবাহিনী অনেক ম্রোকে গুলি করে হত্যাও করে। বর্তমানে এখানে কয়েকটি পরিবার ছাড়া সেখানে আর কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ ম্রো পরিবার নেই।

অন্যদিকে আলীকদম উপজেলার চিউনী পাড়া, ইয়ংকি পাড়ার সীমানাও পূর্বের তুলনায় অনেক সংকুচিত হয়েছে। গ্রামের কয়েক পরিবারের নিজ নামে ভূমি আছে বলে কোনো রকমের মাথা গোঁজার স্থান দখল করে আছে। তারপরও তাদের সমস্যার সীমা নেই। ম্রোদের শ্মশানভূমি নিয়ে অনেকদিন বিরোধ চলছে। আবার রাবার চাষ, বন বাগান, ফল বাগানসহ হর্টিকালচারের নামে বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট দীর্ঘমেয়াদি ভূমি লিজ দেয়া হয়ে আসছে। লিজ প্রদত্ত ভূমির মধ্যে রয়েছে ম্রোসহ অন্যান্য আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি। অন্যদিকে আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকার কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে কেবলমাত্র রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৭,৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় (ভৌমিক ও ধর, ১৯৯০, পৃ. ৪৮৪)। সেনানিবাস কর্তৃপক্ষ ২০০৭ সালের মার্চ মাসে প্রায় চার হাজার পরিবারকে ঐ এলাকা ছেড়ে যেতে নির্দেশ জারি করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ম্রো পরিবার (মে, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৬)।

## ঐতিহ্যবাহী জুমচাষ

ম্রো জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ও অর্থনীতির মূল ভিত্তি প্রধানত ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ। ম্রোরা যেহেতু পাহাড়ে বসবাস করে সেহেতু তাদের সমতলে আবাদি জমি নেই বললেই চলে। স্বাভাবিকভাবে জুম চাষই তাদের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন। ম্রোরা সাধারণত নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে, নির্দিষ্ট ঋতুতে ও মৌসুমে জুমচাষ আরাম্ভ করে। অনেক সময় গ্রাম হতে অনেক দূরে জুমচাষ করলেও তখন সমস্ত পরিবার কিছুদিনের জন্য জুমক্ষেতে চলে যায়। ফসল উত্তোলন শেষ হলে পুনরায় গ্রামে ফিরে আসে। কেউ যদি একস্থান থেকে অন্যত্রে চলে যায়, তাহলে গ্রামের লোকদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারিত সে সীমানায় বাস করে। ভূমির বণ্টনের ব্যাপারে গ্রামের কার্বারীর (মাতবর) ভূমিকা প্রধান। নতুন স্থানে নতুন বসতি স্থাপন করেলে নতুনভাবে জুমভূমি বণ্টন করতে হয়। পাড়ার কার্বারী গ্রামে সবাইকে ডেকে একটি সভা আহবান করে সবার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্রামের সীমানার গণ্ডির মধ্যে জুমচাষযোগ্য ভূমি গ্রামের প্রত্যেক পরিবারকে সমানভাবে বন্টন করে। এমনভাবে জুমভূমি বণ্টন করা হয়, পর্যায়ক্রমে সকল পরিবার পাশাপাশি বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ জুম চাষ করতে পারে। ম্রো সমাজে ভূমি নিয়ে তেমন বড় ধরনের বিরোধ দেখা যায় না। কারো দখলকৃত জায়গা কেউ যদি জুম চাষ করতে ইচ্ছে করে, তাহলে এক বোতল মদ ও একটি মোরগ মালিককে উপঢৌকন দিয়ে অনুমতি নেয়ার রীতি আছে।

জুমচাষের জন্য প্রথমে চাষোপযোগী পাহাড়ের অংশ বেছে নেয়া হয়। জানুয়ারি-ফেব্রয়ারি ও মার্চ মাসে জুমচাষের জন্য জঙ্গল পরিষ্কারকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে। গাছ-পালা, তৃণ-লতা-গুল্ম কেটে রোদে শুকিয়ে রাখার পর পুড়িয়ে ফেলা হয়। পরবর্তীতে আগুনে

পোড়ানোর ছাই সার হিসেবে কাজ করে। জুমচাষে কোনো হালের প্রয়োজন হয় না। পুরোনো দা, শাবল দ্বারা মাটিকে সামান্য আলগা করে ফসলের বীজ বপন করতে হয়। ধানের সাথে তুলো, বরবটি, তিল, যব, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, মরিচ, ঢ্যাড়স ও নানা রকমের শাক-সবজির বীজ একসাথে মিশিয়ে বপন করা হয়। একবার জুমচাষ করার পর জুমের উর্ববরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সেই পাহাড়কে কমপক্ষে ৫ থেকে ১০ বছর অনাবাদি অবস্থায় রাখতে হয়। পতিত পাহাড়ের জমিতে চাষ করা হয় বলে জুমচাষের কোনো সার প্রয়োগ ও সেচের প্রয়োজন হয় না। শুধু গজিয়ে উঠা আগাছাগুলো নিড়ানি ও দা দিয়ে কেটে ফেলা হয়। বিভিন্ন ফসলের বীজ এক সাথে বপন করা হলেও ফলন পাকে একেক সময় এবং তদানুসারে ফসল তুলতে হয়।

কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যার চাপ, জুমচাষের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসা, জুমচাষের মধ্যবর্তী বিরতিকাল হ্রাস পাওয়া ও সর্বোপরি জমির উর্ববরতা শক্তি কমে যাওয়ার ফলে জুমচাষে আগের মতো ফলন পাওয়া যায় না। আগে যেখানে জুমচাষ করে সারা বছরের খোরাকি সংগ্রহ করা যেতো, এখন তা আর সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে জুমচাষের মাধ্যমে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা ম্রোদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেছে। এভাবে আজ ম্রো জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্য আদিবাসীরা তাদের জুমচাষ হারিয়ে ফেলেছে এবং নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ম্রোরা এখন জুমচাষ করতে না পেরে নিজভূমে পরবাসী হয়ে চরম আর্থিক সংকটে মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

**ধর্মান্তর ও জীবন-মান পরিবর্তন**

পাহাড়ি জাতীগোষ্ঠী মনেই সহজ ও সরল। এই সরলতার সুযোগ গ্রহণ করে খ্রিস্টানসহ অন্যান্য মিশনারি বহু আদিবাসী ও উপজাতিকে ধর্মান্তর করতে সমর্থ হয়েছে। মিশনারিরা আদিবাসীদের অবশ্য এভাবে প্রলুব্ধ করেন না যে, খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলে তারা আদিবাসীদের জন্য জমি আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য করবেন। কিন্তু আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, পাদরী বা ধর্ম যাজক সাহেবরা কেবল মাত্র তাদের আত্মার উন্নতির জন্য আসেননি, বরং বৈষয়িক উন্নতিতে সাহায্য করে থাকেন। এই মনোভাবের প্রসার করাতেই যে দলে দলে আদিবাসী খ্রিস্ট বা অন্যান্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ধর্মান্তরিত কয়েকজন নিরক্ষর ম্রো'র সাথে আলাপ করে জানতে পেরেছি যে, তারা খ্রিস্ট বা অন্য কোনো ধর্মে ধর্মান্তর হয়ে মোটেই সুখী নয়। তারা স্পষ্ট করে বলে, আমরা যতদিন গীর্জায় বা অন্য উপাসনালয় থাকি, ততদিন টাকা-পয়সা, কাপড় চোপড় এবং নানা ধরনের সাহায্য পাই। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে গেলেই আমরা ম্রো, আমরা স্বজাতি এবং নিজধর্মের প্রতি বিশ্বাসী। মোদ্দাকথা হচ্ছে, যারা বিভিন্ন এনজিও কিংবা বৈদেশিক বা দেশীয় কোনো মিশনারি সাহায্য সংস্থার উদ্দোগে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নামে প্রদত্ত টাকার লোভ সামাল দিতে

না পেরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধর্মান্তর হয়েছে, তারা পরবর্তীতে মানসিক অর্ন্তদ্বন্দ্বে ভুগছে। তারা কোথাও অন্তরে আত্মার চরম শান্তি খুঁজে পায় না। তবে সুখের কথা ম্রো জনগোষ্ঠীর যারা ১৯৮৬ সালের দিকে আদিবাসী ম্রো নেতা মেনলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "ক্রামা ধর্ম" গ্রহণ করছে, তারা অনেকটা আত্মিক শান্তির সাথে বসবাস করছে। কারণ ম্রো জনগোষ্ঠীর যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এই ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা তাদের পূর্বপুরষদের লোকজসংস্কৃতি পালন করার সাথে সাথে নতুন বোধগম্য ও শিক্ষানীয় "ক্রামা ধম" পালন করে আসছে এবং এই ধর্ম পালন করছে ২/৩ পুরুষ ধরে। ধর্ম গুরু মেনলে তাঁর প্রবর্তিত "ক্রামা ধর্মে" প্রচলিত নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এইজন্য তিনি নিজে একটি ভাষার প্রবর্তন করেছেন। যে ভাষার ম্রোদের তিনটি গ্রামের প্রত্যেকটিতে একটি করে প্রাইমারি স্কুল আছে, যেটি গ্রাম পরিদর্শন করতে গিয়ে চোখে পড়েছে। তাদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে কিছু ম্রো প্রাইমারি স্কুল শেষ করে দেশের প্রচলিত নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হচ্ছে, শিক্ষিত ম্রো পরিবার যারা ক্রামাধর্মাবলম্বী তারা বেশির ভাগই চাকুরী, ব্যবসা কিংবা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। অনেকে আবার স্বাবলম্বী হবার চেষ্টায় রত। তবে সরকার যদি তাদের বসবাসরত গ্রামগুলোর সাথে সমতলের লোকালয়ের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতের সংযোগ, চিকিৎসাসেবা, নিরাপত্তা সহ আধুনিক জীবনমানের সকল উপকরণ নিশ্চিত করে, তাহলে দেশের অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নে ক্রামাধর্মাবলম্বী ম্রোরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

**ক্রামা ধর্মাবলম্বীদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন**

সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের রূপান্তর বা রদবদল। সমাজের পরিবর্তনশীলতা সমাজের অনিবার্য এক বাস্তবতা। কিন্তু কোনো সমাজই স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয় না। পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। যেমন শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে সমাজ উন্নত হয়। এখানে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষা। দরিদ্রতা শিক্ষা অর্জনের বড় বাধা। আবার নিরক্ষরতা দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি করে। বস্তুত এরূপ নানা কারণ ও আন্তঃসম্পর্কের ফলেই সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। এরই বাস্তবতায় ক্রামা ধর্মের অনুসারীদের সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের বেশ কয়েকটি কারণসমূহ লক্ষ্য করা যায়। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা হতে যা সহজেই দৃশ্যমান হয়। এ সমাজের পরিবর্তন, রূপান্তর বা রদবদলের কতগুলো কারণ রয়েছে। যেমন ১. ভৌগোলিক কারণ: ভৌগোলিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক অবস্থা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্রামা ধর্মাবলম্বীদের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে তাদের সভ্যতা ও কৃষ্টি বিকশিত হয়েছে। তবে বর্তমানে পাহাড় ধ্বংস ও অতি মাত্রায় বৃক্ষ নির্বনের ফলে তাদের ভৌগোলিক ও জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন চোখে পড়ে। ফলে তাদের বর্তমান পেশা পরিবর্তনে অনিবার্য হয়ে পড়েছে। একইসাথে ক্রমবর্ধমান

জলবায়ুর পরির্তন তাদেরকে সমতলভূমি বা নগর-স্থানান্তরকে উৎসাহিত করছে। ২. আন্দোলন: সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে আন্দোলন বা বিপ্লব। সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহের প্রচলন, নারীশিক্ষা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বিলোপ ইত্যাদি সংস্কার সাধিত হয়েছে। গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, নারীর সমতা, পরিবেশ, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে আন্দোলন মানুষকে অধিকার সচেতন করে যা সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে। এক্ষেত্রে "ক্রামা ধর্ম" অনুসারীদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মেনলের সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। কারণ মেনলের শিক্ষা ও বর্ণমালা আবিস্কারের ফলে তাদের সমাজের লোকেদের সহজেই তিনি তাদের অধিকার, সুসাশন, সমতা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পেরেছিলেন। ৩. উৎপাদন ব্যবস্থা: দীর্ঘমেয়াদে সমাজের দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধনে উৎপাদন ব্যবস্থার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। দাস নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা হতে সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের মাধ্যমে ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। একইভাবে সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের মাধ্যমেও সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শিল্পোৎপাদন এবং সেবাখাত নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য। কোনো সমাজে ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন হলে সেখানে নগরায়ন ত্বরান্বিত হয়। ফলে সমাজ সনাতন ব্যবস্থা থেকে আধুনিকায়নের দিকে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রেও মেনলে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা, বাজারজাতকরণ এবং কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ব্যবস্থার শিক্ষা সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচারের সাথে সাথে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ জনমত তৈরীতে জোরালো ভূমিকা পালন করেন। ৪. শিক্ষা: সামাজিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। অজ্ঞতা, অন্ধত্ব, কুসংস্কার ইত্যাদি হতে মুক্তি দিয়ে শিক্ষাই মানুষকে সমাজোপযোগী করে তোলে। এ জন্য শিক্ষা সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম। শিক্ষা একটা সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে পারে। শিক্ষা মানুষের পেশা, রুচি, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ এবং আর্থিক সক্ষমতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। ম্রো সমাজে যুগান্তকারী ঘটনা হচ্ছে এই সমাজে মেনলে কতৃক নতুন একটি বর্ণমালা প্রর্বতন। নতুন বর্ণমালা প্রবর্তনের ফলে তাদের শিক্ষা-দিক্ষা, ধর্মশিক্ষা সর্বপরি নিজেদের সহজেই আলোকিত করার পথ তৈরী হয়। ৫. সরকার ও রাজনীতি: সামাজিক পরিবর্তনে সরকার ও রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রত্যয়। ম্রোদের সামাজিক পরিবর্তনে মেনলে ও তাঁর পরবর্তী ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। অর্থাৎ তাদের পরবর্তী ও ধারবাহিক সামাজিক পরিবর্তনে গ্রাম্য সরকার ও তাদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অনস্বীকার্য। ৬. ধর্মীয় চেতনা: ধর্মীয় চেতনার যৌক্তিকতার বিকাশ সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক। সমাজে যখন নানারকম অনাচার, অসামাজিকতা বৃদ্ধি পায় তখন ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শ সুস্থ্য সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে। ম্রো সমাজে ধর্মগুরু মেনলে ধর্মীয় চেতনা ও আদর্শের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটনে সক্ষম

হয়েছিলেন। ৭. প্রচার-প্রচারণা: কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালানো হলে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে পড়ে। মেনলে ব্যাপক জনমত তৈরী করার কারণে, তাদের ধর্মীয় ও আর্থসামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিদেশী পণ্য বর্জন করে দেশীয়পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার তাদের সমাজে দৃশ্যমান পরিবর্তন এনেছিল। তাদের নিজস্ব ভাষার জন্য আন্দোলন, দারিদ্র্য মুক্তি আন্দোলন, কুসংস্কাররোধ বিষয়ে বহুমুখী প্রচারণার ফলে সমাজের নেতৃত্ব, ক্ষমতা কাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। সর্বশেষ মেনলে বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রচারণাও সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৮. গণমাধ্যম: আধুনিক সমাজের অনিবার্য উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যম। পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন, বেতার, ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল ফোন প্রভৃতি বিরাট সংখ্যক মানুষের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম। তাদের গ্রামগুলোতে পরিদর্শনে দেখা গেছে, ম্রো তথা "ক্রামা ধর্ম" অনুসারীদের সামাজিক পরিবর্তনে গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যম জনমত গঠন এবং সামাজিক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গণমাধ্যম পরিবর্তন আনয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পেরেছে, বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ৯. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা: যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বশর্ত বলা যেতে পারে। ভাষাগত কিংবা অবকাঠামোগত যোগাযোগ ব্যবস্থা যখন খুব অনুন্নত ছিল তখন সমাজও ছিল বদ্ধ, স্থির এবং অনগ্রসর। কিন্তু ম্রোদের বসবাসরত এলাকাগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বেশ উন্নত হয়েছে, সেই সাথে সামাজিক পরিবর্তনও তত দ্রুততর হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামের অভ্যন্তরে এবং গ্রামের সাথে শহরের সড়ক, জলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমাজজীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। ১০. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন: ঐতিহ্যবাহী সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান সর্বাধিক। বাষ্পীয় ইঞ্জিন থেকে আজকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, সামাজিক সম্পর্ক ও শ্রেণি-পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। বর্তমানে "ক্রামা ধর্ম" অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে পরিদর্শন শেষে দৃষ্যমান হয়েছে যে, তারা মেনলের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের পূর্ব-পুরুষদের পেশা পরিবর্তন করেছে, মোবাইল ফোনে কথা বলতে অভ্যস্ত হচ্ছে, পাড়ায় পাড়ায় সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে, অনেকেই উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হচ্ছে, কেউ অসুস্থ্য হলে সদর-উপজেলার হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করছে।

অর্থাৎ, যে কোনো সমাজের পরিবর্তন যেমন অনিবার্য, শ্বাশ্বত, তেমনি কাঙ্ক্ষিতও। তবে এ পরিবর্তন আপনা-আপনি হয় না। পরিবর্তনের পিছনের কিছু কারণ এবং কারো

ভূমিকা সক্রিয় থাকে। ম্রো সমাজেও ধর্মীয় নেতা মেনলের ভূমিকার পাশাপাশি ভৌগোলিক কারণে যেমন সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি শিক্ষা, নেতৃত্ব, নতুন ধর্ম তথা অর্থনৈতিক (উৎপাদন ব্যবস্থা), রাজনৈতিক (সরকার, দল, আদর্শ), সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণেও এই সমাজের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। সেই সাথে বর্তমান প্রযুক্তির বিপ্লব ও ব্যবহার "ক্রামা ধর্ম" অনুসারীদের সমাজের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে এবং সর্বশেষ গণমাধ্যম, প্রচারণা এমনকি আধুনিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও "ক্রামা ধর্ম" অনুসারীদের সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## উপসংহার

বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এদেশে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী ছাড়াও প্রায় ৪৫টির অধিক ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এসব জাতি যুগ যুগ ধরে নিজস্ব ও সমৃদ্ধ সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগলিক পরিবেশ, দৈহিক-মানসগঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রাসহ নানা দিক থেকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশেষ করে বাংলাদেশের পার্বত্য তিনটি জেলায় বসবাসরত আদিবাসী ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বছরব্যাপি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড এবং পোষাক-পরিচ্ছদ, খাবার, বিভিন্ন রীতিনীতির পরিচয়ে বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য সকল আদিবাসী ও উপজাতীয় গোষ্ঠী থেকে সবচেয়ে বেশী আলোচনায় থাকে। পার্বত্য জেলা বান্দরবানসহ অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত অন্যতম ম্রো জনগোষ্ঠীর সম্প্রতি তাদের আদি ধর্ম পরিবর্তন করে আদিবাসী ও সমতলের সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পূর্বে ম্রো নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মাঝে, খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হলেও ম্রো নৃগোষ্ঠি খিৃস্টধর্ম দ্বারা তেমন প্রভাবিত বা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। আবার অনেক পূর্বে থেকেই ম্রো সমাজে বৌদ্ধ ধর্মরীতির প্রচলন থাকলেও তারা সর্বপ্রানীবাদীর আচার-অনুষ্ঠানও প্রাত্যহিক জীবনে মেনে চলেছে। সম্প্রতি সাধুপুরুষ মেনলে ম্রোরদ্বারা তাদের সমাজে নতুন "ক্রামা ধর্ম" প্রবর্তনের ফলে এর সহজ বোধগোম্যতা ও আত্মিক প্রশান্তির দরুন সর্বসাধারণ ম্রো জাতিগোষ্ঠী অতি আগ্রহের সহিত এ ধর্ম গ্রহণ করেছে। মূলত: সমাজের নানান কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করাই ছিল মেনলের একমাত্র উদ্দেশ্য, যেটা সাধারণ ম্রোদের দারুণভাবে আর্কষণ করেছে। পাশাপাশি মেনলে কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ভাষা গ্রহণে তাদের সমাজের জীবন-মান আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। "ক্রামা ধর্ম" অনুসারীদের সমাজে পরিদর্শন ও তাদের সাথে আলাপ-আলোচনায় মনে হয়েছে তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবন-মান পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

## গ্রন্থপঞ্জি

আলম, মহিবুল। (২০০২)। *বাংলাদেশের উপজাতি*। হাতেষড়িঃ ঢাকা।

আহমেদ, ড. নিজাম উদ্দিন। (১৯৯৭)। *পৃথিবীর আদিম সমাজ*। বিজয় প্রকাশঃ ঢাকা।

আহমেদ, মনোয়ার। (২০১২)। *বাংলাদেশের উপজাতীয় সংস্কৃতি*। মাওলা ব্রাদার্সঃ ঢাকা।

উদ্দিন, ফরিদ। (২ নভেম্বর, ১৯৯৯)। *মুরং উপজাতীদের জীবন ধারা*। দৈনিক সংবাদঃ ঢাকা।

এস. এ. প্রু। (১৯৯৬)। *উপজাতীয় গল্প সংকলন (খন্ড-১)*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনিস্টিটিউটঃ রাঙ্গামাটি।

কামাল, মেসবাহ, জাহিদুল ইসলাম, সুগত চাকমা (সম্পাদনা)। (২০০৭)। *আদিবাসী জনগোষ্ঠী*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিঃ ঢাকা।

খান, আব্দুল মাবুদ। (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের ম্রো উপজাতির জীবনধারা*। বাংলা একাডেমিঃ ঢাকা।

চাকমা, মঙ্গল কুমার, জেমস ওয়ার্ড খকশী প্রমূখ (সম্পাদনা)। (২০১৫)। *বাংলাদেশের আদিবাসীঃ এথনোগ্রাফিয় গবেষণা (১ম খন্ড)*। উৎস প্রকাশনঃ ঢাকা।

চাকমা, সুগত। (১৯৯০)। *বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার*। নওরোজ কিতাবিস্তানঃ ঢাকা।

চৌধুরী, সাইফুর রহমান (সম্পাদনা)। (১৯৯৮)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও উপজাতির রূপকথা*। বাংলা প্রকাশঃ ঢাকা।

জলিল, ড. মুহম্মদ আব্দুল। (১৯৯৩)। *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*। *বাংলা একাডেমিঃ* ঢাকা।

দেওয়ান, অশোক কুমার। (১৯৯৩)। *চাকমা জাতির ইতিহাস*। শিকড়ঃ ঢাকা।

বড়ুয়া, জিতেন্দ্র লাল। (২০০৬)। *বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশঃ ঢাকা।

বন্দোপাধ্যয়, অমিতাভ, কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত (সম্পাদনা)। (১৯৯১)। *ধর্ম দর্শন*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদঃ কলকাতা।

বাতেন, মোহাম্মদ অবদুল। (২০০৩)। *বাংলাদেশের ম্রো উপজাতির জীবনধারা*। বলাকা প্রকাশনঃ চট্টগ্রাম।

ভৌমিক, নিমচন্দ্র, বাসুদেব ধর (সম্পাদনা)। (১৯৯০)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ও ক্ষুদ্রজাতি*। ইত্যাদি প্রকাশঃ ঢাকা।

মজিদ, মুস্তফা। (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের মঙ্গোলীয় আদিবাসী*। মাওলা ব্রাদার্স: ঢাকা।

মজিদ, মুস্তফা। (১৯৯২)। পটুয়াখালির রাখাইন জাতি। বাংলা একাডেমি: ঢাকা

মহিবুল আলম। (২০০২)। *বাংলাদেশের উপজাতি*। হাতেখড়ি: ঢাকা।

মাহবুব হাসান, মো. আবদুল মতিন আকন্দ, মোহাম্মদ ইসতিয়াক হোসেন (সম্পাদনা)। (১৯৯৫)। *বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভূগোল ও পরিবেশে*। বাংলা একাডেমি: ঢাকা।

মে, ভল্কগাং। (১৯৯৫)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌমসমাজ*। ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা।

ম্রো, ইয়াংঙান। (২০১৫)। *ক্রামাদি*, অনঘ প্রকাশন: ঢাকা।

ম্রো, মেনলে। (১৯৯৯)। *রিইয়ূং খিতি (সু-নীতি)*। বলাকা প্রকাশন: চট্টগ্রাম।

রহমান, মিজানুর। (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪)। বন ও বনের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ভুবন। পাক্ষিক চিন্তা, *৪*(৩): ঢাকা।

শিশির, শামসুদ্দীন। (১৭ জানুয়ারি, ২০০২)। *ম্রো উপজাতি: সমাজ ও সংস্কৃতি*। দৈনিক আজাদী: ঢাকা।

সঞ্জীব দ্রং। (২০০৯)। *আদিবাসী মেয়ে*, নতুন ধারা: ঢাকা।

সাগর, সরওয়ার। (২০১০)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী*। কথা প্রকাশ: ঢাকা।

সাত্তার, আবদুস। (১৯৭৭)। *অরণ্য সংস্কৃতি*, মুক্তধারা: ঢাকা।

সাত্তার, আবদুস, (১৯৭৫)। *অরণ্য জনপদে।* আদিল ব্রার্দাস এণ্ড কোং: ঢাকা।

সিংহ, রামাকান্ত। (২০০১)। *বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী*। মণিপুরী প্রকাশনী: ঢাকা।

সুর, অতুল। (১৯৭৯)। *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*। *জিজ্ঞাসা:* কলিকাতা।

সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা। (১৯৯৬)। *পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি*। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট: রাঙ্গামাটি।

হক, খাজা কামরুল। (১৯৯৯)। *বাংলাদেশের উপজাতি*।... ঢাকা।

হানাফী, জাফর আহম্মদ। (১৯৯২)। *উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী: ঢাকা।

হাফিজ রশিদ খান ও বাবুল বড়ুয়া (সম্পাদিত)। (১৯৯০)। *সমুজ্জ্বল সুবাতাস*। বালাঘাট: বান্দরবন।

Bu, U San Shwe. (1993). *Research papers on Old Arakan*, Yangun: Mayanmar.

Dalton, Edward Tuite. (1872). *Descriptive Ethnology of Bengal*. Printed for the Govt. of Bengal.

G. Thomson. (1958). *Studies on Ancient Greek Society*. London.

Hunter, W. W. (1875) *A Statistical Account of Bengal. V. Districts of Dhaka, Backergange, Faridpur, Jessore and Hill Tracts of Chittagong. London: Triber & Co.*).

J. Biddulph. *Tribes of Hindu Kosh*.

Khan, A. M. (1998). *The Maghs*: *A Buddhist Community in Bangladesh.* University Press Limited.

Loffler, Lorenz G. *MRU: Hill people on the border of Bangladesh.*

Lewin Capt. T.H. (1883). *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein.* Calcutta.

Phayre, Sir Arthur. (1883). *History of Burma*. London.

Qureshi, Md. S. (Edited). (1989). *Tribal Culture in Bangladesh*. University of Rajshahi: Rajshahi.

Rajput, A. B.. (1916). *The Tribes of the Chittagong Hill Tracts*. Karachi.

Sattar, Abdus. (1971). *In the Sylven Shadow*. Bangla Academy: Dhaka.

Sir J. G. Frazer. (1960). *The Golden Bough*, Abridged Ed.: London.

Wise, James. (1883). *Notes on Races, Tribes and Sastes in Eastern Bengal*. Calcutta.

------. (1975). *Tribal Culture in Bangladesh*, Muktadhara: Dhaka.


**সাক্ষাতকার**

১. সাক্ষাতকার: মেন লু ং ম্রো (ক্রামা ধর্মগুরু), বয়স-৬৩, গ্রাম: মেরিং চর কেংকো ম্রো পাড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৭/১১/২০২০

২. সাক্ষাতকার:পুংজেং ম্রো (ক্রামা ধর্মগুরু), বয়স-৭২, গ্রাম: মেরিং চর কেংকো ম্রো পাড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৭/১১/২০২০

৩. সাক্ষাতকার: মেনমিং ম্রো (ক্রামা ধর্মগুরু), বয়স-৬০, গ্রাম: মেরিং চর কেংকো ম্রো পারা, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৭/১১/২০২০

৪. সাক্ষাতকার: মেনকোক (ক্রামা ধর্মগুরু), বয়স-৪৮, গ্রাম: মেরিং চর কেংকো ম্রো পাড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৭/১১/২০২০

৫. সাক্ষাতকার: থৈয়ং লক ম্রো (ক্রামা ধর্মগুরু), বয়স-৬৩, গ্রাম: মেরিং চর কেংকো ম্রো পাড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৮/১১/২০২০

৬. সাক্ষাতকার: মান অং ম্রো (ক্রামা ধমানুসারী), বয়স-৪০, গ্রাম: মেরিং চর কেংকো ম্রো পাড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৮/১১/২০২০

৭. সাক্ষাতকার: মেনলোম ম্রো (ক্রামা প্রধান ধর্মগুরু), বয়স-৬২, গ্রাম: মেরিং চর কেংকো ম্রো পাড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৮/১১/২০২০

৮. সাক্ষাতকার: থোয়াইচিং ম্রো (হেডম্যান), বয়স-৬১, গ্রাম: মেরিং চর কেংকো ম্রো পাড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৮/১১/২০২০

৯. সাক্ষাতকার: বেইংক ম্রো (কারবারী), বয়স-৫৫, গ্রাম: মেরিং চর কেংকো ম্রো পড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৮/১১/২০২০

১০. সাক্ষাতকার: পাটাশ ম্রো (কারবারী), বয়স-৫৬, গ্রাম: জালানী পাড়া পাড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৮/১১/২০২০

১১. সাক্ষাতকার: ইং ওয়াই ম্রো (ক্রামা ধর্মানুসারী), বয়স-৫০, গ্রাম: কাইমেন ম্রো পাড়া, থানা: আলীকদম, বান্দরবান, তারিখ:৮/১১/২০২০

১২. সাক্ষাতকার: মং খিং মারমা, শিক্ষার্থী: এম.এ.,বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,তারিখ:৮/১১/২০২০